www.muktobuli.com

মুক্তবুলি

পাঠক যারা, লেখক তারা

নভেম্বর-ডিসেম্বর-২০১৯

বরিশাল বিভাগের নদ-নদী

- উপমহাদেশের শিল্প-সাহিত্যে কি ক্ষয়িষ্ণুবাদ ধরা দিচ্ছে?
- বাংলাদেশের বিষখালী বনাম অস্ট্রেলিয়ার জর্জ নদী
- বাঙালির ঐতিহ্য রূপালি ইলিশ বৃত্তান্ত
- জামায়াতে নামাজ আদায় মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য
- ভারত প্রসঙ্গ, আবরার হত্যাকাণ্ড, অতঃপর...
- নদীর সাথে ঐতিহ্য হারাচ্ছে রকমারি নৌকা
- শিক্ষা সংবাদ, হেলথ টিপস্, কবিতা ও ছড়াসহ নিয়মিত অন্যান্য বিভাগ

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ২০১৯-২০ সেশন

অবিস্মরণীয় সাফল্যগাথা

এ বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায়
প্রথম ১০ জনে ০৭ জন সহ
সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২৭১৩ জন

ফাবিহা সারওয়ার পৃথা, বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ
জাতীয় মেধায় ৫৯তম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

সারা হক, বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ
জাতীয় মেধায় ৬০তম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

রাইয়ান রহমান, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ
জাতীয় মেধায় ১৭৯তম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

রেটিনা বরিশাল শাখা থেকে DMC তে-৩ জন,
SSMC তে-৫ জন, ShSMC তে ৭ জন সহ
সর্বমোট ৭৩ জনের চান্সপ্রাপ্তি

রেটিনা
মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কোচিং, বরিশাল শাখা

01707781786
01711956719
01782345465
01786815253

'বায়তুল ফালাহ্', উত্তর আলেকান্দা, পলিটেকনিক মোড়, বরিশাল।

প্রধান উপদেষ্টা
মাহমুদ হোসেন দুলাল

উপদেষ্টা সম্পাদক
মোঃ আবদুল হাই
মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশক ও সম্পাদক
আযাদ আলাউদ্দীন

উপ-সম্পাদক
জাকিরুল আহসান

নির্বাহী সম্পাদক
মো: তৈয়বুর রহমান আজাদ

সহযোগী সম্পাদক
এস.এম.এ. জলিল সিদ্দিকী (সবুজ)

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো: কবির

তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
মাহমুদ ইউসুফ
সৈয়দ ওয়ালিদুর রহমান

ডিজাইন
মোঃ হাবিবুর রহমান
সাতরং সিস্টেমস্, বরিশাল

প্রচ্ছেদের ছবি
হাছিব মৃধা (এসএনডিসি)

প্রকাশকাল
১১ম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকাশনায়
বরিশাল সংস্কৃতিকেন্দ্র

মূল্য: ৩০ টাকা

যোগাযোগ ও লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বরিশাল সংস্কৃতিকেন্দ্র

৪৫ জিলা পরিষদ মার্কেট, বটতলা, বরিশাল
মোবাইল: ০১৭১২-১৮৯৩৩৮
E-mail: bskmuktobuli@gmail.com
web: www.muktobuli.com

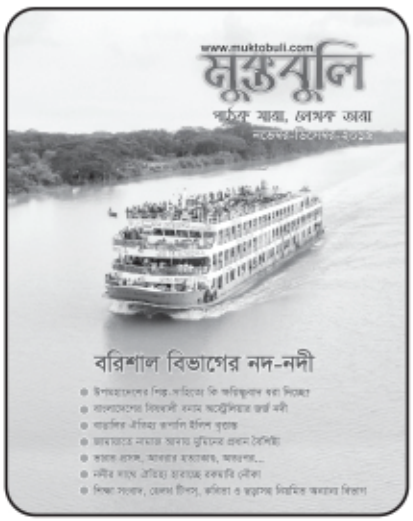

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। নদীকে ঘিরে পরিচালিত হচ্ছে এদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা। দক্ষিণাঞ্চল তথা বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নদ-নদীর সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য আমরা দক্ষিণাঞ্চলের নদ-নদীকে ঘিরে প্রস্তুত করেছি এবারের 'মুক্তবুলি'। এবিষয়ে গবেষণাধর্মী আরো অনেক লেখা আসার সুযোগ ছিল, কিন্তু মুক্তবুলি'র পৃষ্ঠার সীমাবদ্ধতা, গবেষণাধর্মী পাঠক ও লেখকের অভাব- সর্বোপরি আমাদের পর্যাপ্ত সময়দানের অভাবে আশানুরূপভাবে সাজানো সম্ভব হয়নি এবারের সংখ্যা। ভবিষ্যতে যদি কেউ নদ-নদী বিষয়ক গবেষণা ও বাস্তবধর্মী মৌলিক লেখা পাঠান তাহলে তা সানন্দে প্রকাশ করা হবে।

মুক্তবুলির শ্লোগান হচ্ছে- 'পাঠক যারা, লেখক তারা' অর্থাৎ পাঠকরাই এর লেখক। অতএব মুক্তবুলিতে লিখতে হলে আগে এই দ্বি-মাসিক ম্যাগাজিনটির একনিষ্ঠ পাঠক হতে হবে। আপনি নিয়মিত মুক্তবুলি পড়লে এর লেখার ধরণ বা পলিসি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া 'লেখা আহবান' কলামে লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মুক্তবুলি নিয়মিত প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রিয় পাঠক, আপনারা যার যার অবস্থান থেকে মুক্তবুলির পাঠক এবং বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির জন্য ভূমিকা রাখবেন, সেই অনুরোধ জানিয়ে এই সংখ্যার সম্পাদকীয় এখানেই শেষ করছি।

শিল্প- সাহিত্যে আলো ছড়াচ্ছে মুক্তবুলি

ফিরোজ মাহমুদ

'পাঠক যারা, লেখক তারা' এ শ্লোগানকে ধারণ করে বিভাগীয় শহর বরিশাল থেকে বরিশাল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সাংবাদিক আযাদ আলাউদ্দীন এর সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের মননশীল ম্যাগাজিন 'মুক্তবুলি'। ইতোমধ্যে এর ঝকঝকে দশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ঈর্ষণীয় সফলতার মাধ্যমে এ ম্যাগাজিনটি বোদ্ধা পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এ ম্যাগাজিনটি ধীরে ধীরে ইনশাআল্লাহ তার অভিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌঁছবে এ কথা দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়।

'মুক্তবুলি'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রতিটি সংখ্যা একটি বিশেষ বিষয়কে ধারণ করে প্রকাশিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় 'মুক্তবুলি'র দশম সংখ্যাটির (সেপ্টম্বর-অক্টোবর-২০১৯) বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে - 'বরিশাল বিভাগের ৬ জেলার নামকরণের উৎস। এতে অত্যন্ত সাবলীলভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে বরিশালের ৬ টি জেলার নামকরণের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন সম্পাদক আযাদ আলাউদ্দীন। বরিশাল বিভাগের প্রতিটি জেলার নাগরিক তাদের স্ব-স্ব জেলার নামকরণের বিষয়ে সম্যক ধারণা পাবেন।

'মুক্তবুলি' তে সৃজনশীল লেখার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, মুক্তিযুদ্ধ, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র, স্বাস্থ্যকথাসহ নিয়মিত প্রতিটি বিভাগকে সাজানো হয় অত্যন্ত সুনিপূণ এবং দক্ষ হাতের আল্পনায়, যা প্রচলিত ম্যাগাজিন থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দেশ বরেণ্য বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ নিয়মিত লিখেন শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন অসঙ্গতি, সমস্যা আর সম্ভাবনা নিয়ে।

এ ম্যাগাজিনটির সাহিত্য বিভাগে নিয়মিত লিখেন দেশের প্রখ্যাত কথাশিল্পী, কবি- সাহিত্যিকগণ। তাদের দক্ষ হাতের পরশে 'মুক্তবুলি' হয়ে উঠে আরো সুন্দর, অনন্য। এখানেই 'মুক্তবুলি'র স্বার্থকতা।

মুক্তবুলি'র ১০ম সংখ্যাটিতে বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন আযাদ আলাউদ্দীন, আহমেদ বায়েজীদ, লায়ন মো. শামীম শিকদার, বেলায়েত বাবলু, মোহাম্মদ এমরান, মামুন- অর- রশিদ, ইতিহাস গবেষক ও প্রাবন্ধিক মাহমুদ ইউসুফ, তরুণ সাংবাদিক জসিম জনি, সোহল রানা, আবদুর রহমান সালেহ, মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, নিয়ামুর রশিদ শিহাব, ডা.কে.এম. জাহিদুল ইসলাম এবং ওবায়দুর রহমান প্রমুখ।

এছাড়াও এই সংখ্যায় ১৯ জন কবির কবিতা স্থান পেয়েছে।

'মুক্তবুলি' মুক্তচিন্তা চর্চার মাধ্যমে এ অঞ্চলের একটি শক্তিশালী মুখপত্রে পরিণত হবে, ইতিহাস- ঐতিহ্যের স্মারক বহন করবে, সৎ আর আদর্শ সাহিত্য চর্চার বিচরণভূমি হবে এ ম্যাগাজিনটি, জ্ঞানপিপাসু পাঠককুলের আস্থা আর বিশ্বাসের হবে পরম ঠিকানা। আমরা এ প্রত্যাশা করি।

'মুক্তবুলি' এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য শুভ কামনা, ভালোবাসা নিরন্তর। সুখ-সমৃদ্ধি আর ফুলে-ফলে সুশোভিত হোক 'মুক্তবলি'। এ কামনা থাকলো।

লেখা আহবান

মুক্তবুলি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২০ সংখ্যার কাজ চলছে। এটি হবে মুক্তবুলির ১২তম সংখ্যা। এই সংখ্যায় লেখা জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০১৯।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদ রচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে 'দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন সম্ভাবনা। আগামী সংখ্যায় পর্যটন কিংবা ভ্রমণ বিষয়ক লেখা প্রধান্য দেয়া হবে। আপনার গ্রামের বাড়ির পাশের কিংবা উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরের আশেপাশে রয়েছে পর্যটনের সম্ভাবনাময় অনেক স্পট। এসব স্পট নিয়ে লিখুন ফিচার। সাথে অবশ্যই ছবি পাঠাবেন।

পদ্মাসেতু, রেললাইন, ফোরলেন সড়ক, পায়রা সমুদ্র বন্দর- এসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতির চাকা কিভাবে ঘুরে দাড়াবে? এ অঞ্চলের পর্যটন সম্ভাবনা কিভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিক রাখবে? এসব বিষয়ে ভাবুন- সেই ভাবনা থেকে লিখে ফেলুন পর্যটন বিষয়ক যে কোনো লেখা।

পর্যটন সম্ভাবনা বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া কিংবা ফিচার লিখে পাঠান মুক্তবুলির ই-মেইল ঠিকানায়। এছাড়াও নিয়মিত অন্যান্য বিভাগেও লেখা পাঠাতে পারেন।

bskmuktobuli@gmail.com

শর্তাবলী

১. ই-মেইল ছাড়া অন্যকোন মাধ্যমে পাঠানো লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. লেখা হতে হবে মৌলিক, অন্যকোন মাধ্যমে প্রকাশিত লেখা ছাপা হবে না। এমনকি ফেসবুকে প্রকাশিত লেখাও মুক্তবুলিতে প্রকাশিত হবে না। মুক্তবুলিতে প্রকাশের পর সংখ্যা উল্লেখ করে 'মুক্তবুলি'র তথ্যসূত্র ব্যবহার করে পরবর্তীতে ফেসবুকে দেয়া যাবে।

৩. অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রকাশিত লেখা কপি করে মুক্তবুলিতে পাঠালে এবং তা প্রমাণিত হলে ওই লেখকের আর কোন লেখা ভবিষ্যতে মুক্তবুলিতে প্রকাশিত হবে না।

৪. লেখা হতে হবে সর্বোচ্চ এক হাজার শব্দের মধ্যে।

৫. এসব নিয়ম মেনে মুক্তবুলিতে যারা মৌলিক লেখা পাঠাবেন, তাদেরকে প্রত্যেক লেখার জন্য সৌজন্য কপি ও 'সম্মানী' প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ ।

আযাদ আলাউদ্দীন
প্রকাশক ও সম্পাদক
মুক্তবুলি
০১৭১২১৮৯৩৩৮

Muktobuli
ফেসবুক পেইজের সাথে যুক্ত থাকতে আপনার ফেসবুক আইডি থেকে লাইক দিন

বরিশাল বিভাগের নদনদী

আযাদ আলাউদ্দীন

ধান, নদী, খাল আর রূপালী ইলিশের ঐতিহ্যপুরী বরিশাল। দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠ, মাঠের মাঝে বহমান স্রোতধারা। মাঠ পেরুলেই পল্লীমায়ের কোল; যেখানে শিশুকিশোরদের কোলাহল আর কৃষক রমণীর স্বপ্ন বুনন। গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে স্রোতস্বীনি খাল। দুই পাড়ের জনজীবনে মুখরিত সকাল-সন্ধ্যা। এই খালের শেষ ঠিকানা হয়ত মেঘনা, তেতুলিয়া, কীর্তনখোলা, পায়রা, বিষখালী, কচা, সুগন্ধা, হরিণঘাটা। যার বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে অগণিত নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ, জাহাজ। জেলেদের পালতোলা নৌকা আর মাঝি-মাল্লাদের ভাটিয়ালি সুরে সুরভিত আকাশ-বাতাস। এই তো আমার বরিশাল। এই তো আমার জন্মভূমি- যার গর্ভ থেকে জন্ম হয়েছিলো শেরে বাংলা ফজলুল হকের মতো বিশ্ব নায়কের।

হাজারো নদী খালের দেশ বরিশাল। ভৌগোলিক বয়স ৪ হাজার বছরের বেশি। তার আগে বঙ্গোপসাগর বা পূর্ব সাগর। বর্তমান বরিশাল বিভাগ পুরোটাই বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ। প্রাগৈতিহাসিককালে নুহ নবির বংশধররা এখানে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন। বাংলার প্রথম মানুষ হযরত নুহ নবির প্রোপৌত্র বঙ। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই এখানে মানবধারা বর্তমান। পরবর্তীযুগে এদের সাথে সংমিশ্রন ঘটেছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর। আরব্য, আর্য্য, মঙ্গোলীয়, তুর্কি, ইরানি, ইংরেজ, পুর্তুগিজ, আরাকানি প্রভৃতি মানবগোষ্ঠীর রক্তধারায় সমৃদ্ধ বরিশালবাসী। নানাজাতির, নানা ফেরকার সংশ্লেষ ঘটলেও ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে আমরা সবাই একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। হয়ত অনিন্দনীয় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যই মানুষ ও মাটি এখানে একাকার। যেখানে আকাশ মিশেছে মাটির মমতায়। সেখানে রাখালের রাখালিয়া সুরে গাঁয়ের আনমনা বালিকার দখিনের বাগানে উদাসী দৃষ্টি। স্বপ্নেরা সেখানে বাসা বাঁধে অনাগত সুখের সন্ধানে। আযানের সুরমুর্ছনার যাপিত জীবনের জয়যাত্রা। মক্তবে মানব শিশুর কুরআন পাঠে মনোনিবেশ। মানুষের মিতালি অবারিত মাঠ ও সবুজ প্রকৃতির সাথে। ঘুম ভাঙে পাখির গানে। জেলেরা ঘরে ফিরে মাছের ঢালি নিয়ে। কৃষক জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে যায় মাঠে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন নদী ও শাখা নদীর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানে এর বাইরেও ১৮ হাজার থেকে ২২ হাজার শাখা ও উপনদী রয়েছে। সে হিসেবে বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬ হাজার। উন্নয়নের নামে নগরায়ন, দখল, ভরাট, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, তিস্তা বাঁধ, ফারাক্কাবাঁধের কারণে দেশের নদনদী বিলুপ্ত। টিকে আছে মাত্র ৮০টির মত। দেশ এখন মরুকরণের পথে। বর্ষা শরৎকালও বৃষ্টিহীন। এভাবে চলতে থাকলে দেশ অচিরেই বসবাসের অযোগ্য হবে। যে বরিশাল ভাসত পানির উপর, আজ সেখানে শুরু হয়েছে পানির জন্য হাহাকার।

বরিশাল জেলা

বরিশাল নগর কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরের পূর্ব পাশ দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে নলছিটি পর্যন্ত কীর্তনখোলা বা বরিশাল নদী নামে প্রবাহিত। কীর্তনখোলার পশ্চিম তীরে আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ও বরিশাল নৌ বন্দর অবস্থিত, যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী-বন্দর। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা 'পাউবো' কর্তৃক কীর্তনখোলা নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর ২১। কীর্তনখোলার দৈর্ঘ্য ১৬০ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৪৯৭ মিটার এবং প্রকৃতি সর্পিলাকার। ফারাক্কা বাঁধ পূর্ব আমলে কীর্তনখোলা আরো বেশি প্রমত্তা ছিলো, সেসময়ে প্রস্থ ছিলো ১ কিলোমিটারের মতো। বর্তমানে চর পড়ে কীর্তনখোলার প্রস্থ কমে গেছে। পাশাপাশি পলি পড়ে নাব্যতাও হ্রাস পেয়েছে। দপদপিয়া আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতু নির্মিত হওয়ায় স্রোত আরও কমে গেছে। ফলে নদীর প্রবাহমানতা দ্রুত কমে যাচ্ছে। বরিশাল সদর উপজেলার অন্যান্য নদী হলো: কালিজিরা, আড়িয়াল খাঁ, তেঁতুলিয়া, বুখাইনগর প্রভৃতি। কীর্তনখোলা থেকে কালিজিরার উৎপত্তি। কীর্তনখোলার গতিপথে উভয় তীরে বর্তমানে দুটি করে শাখা রয়েছে। পূর্বতীরে বুখাই নগর ও বাকেরগঞ্জ খাল এবং পশ্চিমতীরে মিরগঞ্জ বা মাধব নদী এবং কালিজিরা শাখা নদীর অবস্থান। কালিজিরা বর্তমানে প্রায় স্রোতহীন। এর দৈর্ঘ্য ১০ মাইল, প্রস্থ ২০০ গজ।

বাংলাদেশের সবচেয়ে নদীবহুল উপজেলা বাকেরগঞ্জ। এ উপজেলায় রয়েছে ১০ টি নদী। তুলাতলি, শ্রীমন্ত, কারখানা, তেতুলিয়া, বিষখালী, পায়রা, পাণ্ডব, গোমা, রাঙ্গাবালিয়া ও খয়রাবাদ এ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পাণ্ডব নদী বাকেরগঞ্জের নেহালগঞ্জ-রঙমাটিয়া নদী হতে উৎপত্তি। পতিত হয়েছে বুড়িশ্বর-পায়রা নদীতে। নদীটি উজানের তুলনায় ভাটির দিকে অধিক প্রশস্ত। দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯ কিমি, গড় প্রস্থ ১৫৮ মিটার। পেয়ারপুর নামক স্থানে একটি ব্রিজ হওয়ায় নদীর নাব্যতা কমে গিয়ে দুই পাশে চর পড়ে গিয়ে নদীটি এখন অনেক ছোটো হয়ে গেছে। নেহালগঞ্জ-রঙমাটিয়া নদী মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নে প্রবহমান আড়িয়াল খাঁ নদ হতে উৎপত্তি হয়ে বাকেরগঞ্জের খয়রাবাদ নদীতে নিপতিত। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২ কিমি, গড় প্রস্থ ১৭৭ মিটার। বাকেরগঞ্জ নদী ৪০ কিমি দীর্ঘ, প্রস্থ ১ কিমি। কারখানা বাকেরগঞ্জের ক্ষুদ্র নদী ।

কবাই নদীর প্রবাহ পথ বাকেরগঞ্জ থেকে শুরু করে পটুয়াখালী পর্যন্ত। বাকেরগঞ্জ-পটুয়াখালীর দীর্ঘতম নদী এটি। দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৭ কিমি। চর কাজল ও বড় বাইশদিয়ার কাছে এর নাম আগুনমুখো। খয়রাবাদ নদী বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার সীমানা নির্দেশক। বাকেরগঞ্জ শহর এর তীরে অবস্থিত। প্রবাহপথের দৈর্ঘ্য ৪০ কিমি, প্রস্থ ২৫০ মিটার, গভীরতা ১৩ মিটার। আয়তন প্রায় ১৫৯ বর্গকিমি। দপদপিয়া ও মাগরের মধ্যবর্তী স্থানে খয়রাবাদ নদী থেকে গজালিয়া বা গঙ্গালিয়া নদীর উৎপত্তি।

আড়িয়াল খাঁ নদ পদ্মার একটি প্রধান শাখা। আড়িয়াল খাঁ হচ্ছে ফরিদপুর, মাদারীপুর ও বরিশাল জেলার একটি নদ। এই নদের দৈর্ঘ্য ৬২ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩০০ মিটার এবং প্রকৃতি সর্পিলাকার। অতীতে এর নাম ছিলো ভুবনেশ্বর। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ইংরেজ সরকার ঠগি দমনের জন্য আড়িয়াল খাঁ নামক একজন জমাদার নিযুক্ত করে। এই সময় ভুবনেশ্বর নদ থেকে একটি খাল খনন করে পদ্মার দক্ষিণাংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। এই খালটিই কালক্রমে বিস্তৃত হয়ে প্রাচীন পদ্মা ও ভুবনেশ্বরের কতকাংশ গ্রাস করে নদীতে পরিণত হয়। এই নতুন খালটির সাধারণ জনগণের কাছে দাঁড়ায় 'আড়িয়াল খাঁ'র নদ'। পরে এর সংক্ষিপ্ত নাম হয় 'আড়িয়াল খাঁ'। এই নদের অববাহিকার আয়তন ১৪৩৮ বর্গ কিমি। এর উৎসস্থল গোয়ালন্দ থেকে প্রায় ৫১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে পদ্মা। এখান থেকে এই নদটি ফরিদপুর ও মাদারীপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বরিশালের উত্তর-পূর্ব কোণে তেঁতুলিয়া নদীতে পতিত হয়েছে। নদটি সারা বছরই নাব্য অবস্থায় থাকে। তবে মার্চ-এপ্রিল মাসে পানির প্রবাহ কমে যায়। জুলাই-আগস্ট মাসে প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ হাজার ঘনমিটার/ সেকেন্ড। এ সময় নদের পানির গভীরতা ১২ মিটার পর্যন্ত থাকে। আড়িয়াল খাঁর নিম্নভাগ জাফরাবাদ নদ ও ডাকাতিয়া নদী। মুলাদী উপজেলা আড়িয়াল খাঁ, নয়াভাঙ্গনির মাধ্যমে ত্রিখণ্ডিত হয়েছে। এছাড়া মুলাদীর অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে জয়ন্তী নদী। মেঘনার শাখা ধর্মগঞ্জ নদ হিজলা উপজেলায় প্রবাহিত। স্রোতস্বিনী মাসকাটা নদী মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় প্রবাহিত।

টরকি নদী পদ্মার শাখা নদী। এটি গৌরনদী দিয়ে প্রবাহিত। সফিপুর নদীও পদ্মার শাখা নদী। টরকি নদীর পূর্বভাগের নাম ছবিপুর নদী। ছবিপুর নদী, লতা নদী আড়িয়াল খাঁর শাখা নদী। লতা নদীর দৈর্ঘ্য ১০ মাইল, প্রস্থ ১ মাইল। আড়িয়াল খাঁর শাখা ডাকাতিয়া, জাহাপুর, শায়েস্তাবাদ, কালিগঞ্জ নামে ভোলায় ইলিশার সাথে মিলিত। মিলিত স্থানের নাম কালাবদর। হিজলা নদী প্রায় ২৪ কিমি দীর্ঘ। বিশারকান্দি নদী ও উজিরপুর নদী উজিরপুর উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত। হারতা নদী উজিরপুর বিশারকান্দি নদী থেকে উৎপন্ন। উজিরপুর নদী ১৬ কিমি দীর্ঘ, ৪০০ মিটার প্রশস্ত।

ওটরা নদী আগৈলঝাড়া, মাহিলাড়া, উজিরপুর দিয়ে প্রবাহিত। নান্দার উপনদী ওটরা। নয়াভাঙ্গনি বা হরিণাথপুর নদী মুলাদি দিয়ে প্রবাহিত। ১৭৮৭ সালে তিস্তা নদীতে ভয়াবহ বন্যার কারণে সৃষ্টি হয় নয়াভাঙ্গনি ও সফিপুর নদ। রাজগুরু নদী বাবুগঞ্জে আড়িয়াল খাঁ থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যা নদীতে প্রবাহিত। দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ কিমি, প্রস্থ ৩৫০ মিটার, গড় গভীরতা ১২ মিটার। অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৭৮ বর্গকিমি। বাবুগঞ্জ শহর এ নদীর তীরে অবস্থিত। কালিজিরা নদীর দৈর্ঘ্য ১৬ কিমি, বিস্তার ৩ কিমি। অতীতের প্রবল স্রোতসম্পন্ন নদীটি বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলাকে আলাদা করেছে। কীর্তনখোলা ও সুগন্ধার মিলনস্থল থেকে উত্তরমুখী নদীটি। বানারীপাড়ায় সন্ধা নদী, নান্দুহার নদী, বিশারকান্দি নদীসহ অসংখ্য নদী ও খাল জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। গৌরনদীর উল্লেখযোগ্য নদী পালরদী ও আড়িয়াল খাঁ। আড়িয়াল খাঁ নদে ঢাকা-বরিশাল রুটের লঞ্চ চলাচল করে। পালরদী নদী গৌরনদী শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। পয়সারহাট নদী আগৈলঝাড়ায় প্রবাহিত।

বরিশালের আঞ্চলিক নদী নান্দা গৌরনদীর নিম্নাঞ্চল থেকে মাহিলাড়া ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে আগৈলঝাড়ায় প্রবেশ করেছে। অতঃপর ক্রমশ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে উজিরপুর উপজেলায় উজিরপুর নদীতে পড়েছে। নলশ্রী নদী বানারীপাড়ার উত্তর সীমান্ত বিশারকান্দি ও হারতা নদীর মোহনা থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সৈয়দকাঠি এলাকায় সন্ধা নদীতে পতিত। হিজলা-মুলাদী উপজেলার জয়ন্তী মেঘনার শাখা নদী। বদরটুনি থেকে নন্দির বাজার পর্যন্ত জয়ন্তী নদী প্রবাহিত। ভাসানীচর নদী কীর্তনখোলা ও নলছিটি নদীরই একটি বর্ধিত শাখা। আড়িয়াল খাঁ নদটি বরিশাল সদর উপজেলার ভাসানী চরে এসে ভাসানীচর নদী নাম ধারণ করে। বরিশাল শহরের ৫ কিমি উত্তরে এই নদীর নাম হয় কীর্তনখোলা। বরিশাল জেলার অন্যান্য নদীর মধ্যে রয়েছে রাঙামাটিয়া নদী, ইলিশ-গণেশপুর নদী, পাণ্ডা নদী, ঘন্টেশ্বর নদী, দাদরিয়া নদী, শিকারপুর নদী, দোয়ারিকা নদী, হাটুরিয়া নদী, মুলাদী নদী, সাতবাড়িয়া নদীসহ অসংখ্য নাম না জানা নদী।

ভোলা জেলা

মেঘনা বা মেঘনা লোয়ার নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চাঁদপুর, শরিয়তপুর, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর ও ভোলা জেলার একটি নদী। পাউবো কর্তৃক মেঘনা লোয়ার নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদী নং ১৮। মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য ২৩২ কিমি, প্রশস্ততা ১১ কিমি এবং নদীটির প্রকৃতি বেণীসদৃশ। মেঘনার শাখা নদী ইলিশার তীরে ভোলার অবস্থান। ভোলার পশ্চিম দিকে ইলিশা প্রবাহিত। অতীতে ইলিশ মাছের প্রাচুর্য থাকায় এর নাম হয় ইলিশা নদী। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ কিমি, বিস্তার ২ কিমি। কালাবদর ভোলার প্রবল স্রোতস্বিনী নদ। এটি আড়িয়াল খাঁর শাখা নদী। ডাকাতিয়া, জাহাপুর, শায়েস্তাবাদ, কালিগঞ্জ ইত্যাদি নামে এটি ভোলার ইলিশা নদীতে মিলিত। বদর নামক কোনো শক্তিমান নাবিকের নামে এ দূরন্ত নদীর নামকরণ বলে অনুমিত। কালাবদরের সেই ভয়ঙ্কর রূপ আজ আর নেই।

তেঁতুলিয়া নদীটি ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা ইউনিয়নের প্রবহমান মেঘনা নদী হতে সূচিত। অতঃপর এর জলধারা চরকাজল, পানপট্টি ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে গলাচিপা উপজেলার চালতাবুনিয়া ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে নিপতিত। নদীতে সারাবছর পানিপ্রবাহ থাকে এবং ছোটো বড় নৌযান চলাচল করে। বর্ষাকালে নদীর পানিপ্রবাহ বেড়ে যায় এবং নদীর অববাহিকা বন্যায় প্লাবিত হয়। নদীটি জোয়ার ভাটার প্রভাবে প্রভাবিত। এই নদী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথম শ্রেণির নৌপথ হিসেবে স্বীকৃত। তেঁতুলিয়া নদী ৫৬ কিমি দীর্ঘ, বিস্তার ৫ কিমি।

দ্বীপাঞ্চল ভোলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা বেতুয়া নদী এখন আর নেই। ভোলাবাসীর অনেক স্মৃতিবিজড়িত প্রমত্তা বেতুয়া নদী মরে গেছে। বেতুয়ার জলে ভেসে গেছে কত জমি, ভিটেমাটি, ঘরবাড়ি, ফসল। বেতুয়ার জলে মরেছে কত গবাদি পশু। বেতুয়ার ভাঙনের গানে বিলীন হয়েছে কত জীবন, সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে কত মানুষ। পূর্বে মেঘনা আর পশ্চিমে তেঁতুলিয়া নদীর মাঝে সংযোগ স্থাপন করে ছিল বেতুয়া নদী। কালের আবর্তে, মহাকালের ঘূর্ণিপাকে বিলীন হয়ে গেছে বেতুয়া নদী। বেতুয়ার বুকে মাছ ধরে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করত। এ নদীতে কুমির ছিলো। বেতুয়া এখন শুধুই স্মৃতি, শুধুই মরা নদী। চরফ্যাশন উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহ হচ্ছে বুড়াগৌড়াঙ্গ, পাঙ্গাশিয়া, মায়া ও বেতুয়া নদী।

পটুয়াখালী জেলা

লাউকাঠি বা পটুয়াখালী নদী শহরের উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত। দৈর্ঘ্য ১২ কিমি, প্রস্থ ৬০০ মিটার। সোনাতলা নদীর দৈর্ঘ্য ১৮ কিমি, প্রশস্ততা ৩৫০ মিটার, গড় গভীরতা ১৭ মিটার, আয়তন প্রায় ৭৫ বর্গকিমি। আন্ধারমানিক নদী পটুয়াখালীর কলাপাড়া দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত। এটি দৈর্ঘ্যে ১৯ কিমি, বিস্তার ২ কিমি। খেপুপাড়া পৌরসভা এ নদীর তীরে অবস্থিত। আন্ধারমানিক নদীর সাথে বঙ্গোপসাগরের সরাসরি সংযোগ আছে। তবে নদীটি স্বাভাবিক প্রবাহ হারিয়ে এখন মরাখালে পরিণত হয়েছে। এজন্য পটুয়াখালী কুয়াকাটা মহাসড়ক প্রধানত দায়ী। কারণ আন্ধারমানিক নদীতে পতিত অসংখ্য খালে বাঁধ দিয়ে এ মহাসড়ক নির্মিত হওয়ায় নদীর পানি চলাচল বন্ধ হওয়ায় এ দুরাবস্থা। কলাপাড়ার অন্যান্য নদীর মধ্যে রয়েছে সোনাতলা নদী, শিববাড়িয়া নদী, আড়পাঙ্গাশিয়া নদী, কচুপাত্রা নদী, ধানখালী নদী।

নীলগঞ্জ নদীর দৈর্ঘ্য ৩৫ কিমি, চওড়া ১ কিমি। খেপুপাড়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত। ধুলিয়া নদী বাউফলের উত্তরদিকে প্রবাহিত। বাউফলের আর একটি নদী লক্ষ্মীপাশা। কাজল নদী বাউফলের তেঁতুলিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে গলাচিপার মধ্য দিয়ে কলাপাড়ায় রাবনাবাদ নদীতে পড়েছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ কিমি, প্রস্থ ৩ কিমি, গড় গভীরতা ১৩ মিটার। অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ১৬০ বর্গমাইল।

লোহালিয়া নদী বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৯৩ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩২৫ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক লোহালিয়া নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর ৮৪। কারখোমা নদী তেঁতুলিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে বাউফল হয়ে লোহালিয়া নদীতে পতিত। গলাচিপা নদী গলাচিপা উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত। আগুনমুখা, চালিতাবুনিয়া, দাড়চিরা ও বুড়াগৌরঙ্গ নদী রাঙ্গাবালি উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত নদী। আগুনমুখা নদী সাগরের মোহনায় এতই উত্তাল ও তরঙ্গসঙ্কুল যে, দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা। তাই এর নাম আগুনমুখা। দাড়চিরা নদী ছোটো ও বড় বাইশদিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

রাবনাবাদ নদীর দৈর্ঘ্য ২৮ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১৮৪০ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। পাউবো কর্তৃক রাবনাবাদ নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর ৮২। রেনেলের ১৭৬৪-১৭৭২ সালের মানচিত্রে রাবনাবাদ নদীর তীরে রাজা কন্দপনারায়ণের নির্মিত দুটি দুর্গ দেখা যায়। বর্তমানে উহার কোনো চিহ্ন নাই। আগুনমুখা নদীতে প্রায় শত বছর আগে উহা বিলীন হয়ে যায়। শিবপুর দিয়ে পটুয়াখালীতে প্রবাহিত বিঘাই নদী ৬ কিমি দীর্ঘ, চওড়া ৩কিমি।

রাজাগঞ্জ নদী পটুয়াখালী জেলার উল্লেখযোগ্য নদী। কোচাবানিয়া নদীর উৎপত্তি রাজাগঞ্জ থেকে। আবার পটুয়াখালী-পায়রা সঙ্গমস্থল থেকে পায়রা নামে রাজাগঞ্জ নদীতে মিশেছে। সদর উপজেলা দিয়ে লোহালিয়া ও পায়রা নদীকে যুক্ত করেছে পটুয়াখালী নদী। রাজাগঞ্জ থেকে কোচাবানিয়া নামে নদীটি সদর উপজেলার বদরপুর ইটাবাড়িয়া ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত। অতঃপর পটুয়াখালী নদী ও পায়রার সঙ্গমস্থলে মিলিত।

গলাচিপার দক্ষিণে প্রবাহিত কাজল বা রাঙ্গাবালি নদী লম্বায় ১৬ কিমি, চওড়া ৩ কিমি। লেবুখালী নদীর উত্তরপ্রান্ত আঙ্গারিয়া নদী ৮ কিমি লম্বা, চওড়া ২ কিমি। তিতখালী নদী লম্বায় ৬ কিমি, বিস্তার ৩কিমি। চাকমাইয়া নদী খেপুপাড়ার চাকমাইয়া গ্রামে প্রবাহিত; যার দৈর্ঘ্য ১৩ কিমি, বিস্তার ২০০ মিটার। শ্রীমন্ত নদী মির্জাগঞ্জের পায়রা নদী থেকে বেরিয়ে ২০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে একই নদীতে পড়েছে। প্রস্থ ২০ মিটার, গভীরতা ৯ মিটার। আববাহিকায় আয়তন প্রায় ৮০ বর্গকিমি। বনচিড়া নদী ১২ কিমি লম্বা, ২কিমি প্রস্থ। পটুয়াখালী জেলার অন্যান্য নদী হলো মসজিদবাড়িয়া নদী, ঢোলেশ্বরী নদী, ভেকরি নদী, দারভাঙ্গা নদী, পুটুয়া নদী, সুরেশ্বর নদী, সুগন্ধা নদী, লেবুখালী নদী, তেগাছিয়া নদী, ডুলিয়া নদী, সুবিদখালী নদী, কালিগঙ্গা নদী, দামোদর নদী, পায়রাগঞ্জ নদী।

বরগুনা জেলা

বলতে গেলে বরগুনার ভূখণ্ডটির চারপাশে ঘিরে আছে অসংখ্য নদনদী আর খাল। পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ ও মধুমতি নদীর অববাহিকায় অবিস্থিত হচ্ছে বরগুনা জেলা। বরগুনার প্রকৃতি নদী আর সাগর নির্ভর। জেলার প্রধান নদনদী হচ্ছে পায়রা, বিষখালী, বলেশ্বর ও হরিণঘাটা। এছাড়া খাকদোন নদ, টিয়াখালী নদী, টিয়াখালী দোন, বগিরখাল, বেহুলা নদী, চাকামাইয়া দোন, নিদ্রাখাল, আমতলী নদী ইত্যাদি জেলার প্রধান নদী ও খাল। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে ৩০০টি প্রাকৃতিক খাল রয়েছে। এ জেলায় মোট ১৬০ বর্গ কিলোমিটার নদী রয়েছে যা জেলার মোট আয়তনের ২২ ভাগ।

বিষখালী নদী ঝালকাঠিতে উৎপন্ন হয়ে বরগুনা জেলার ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত। এর দৈর্ঘ্য ৬৪ কিমি প্রস্থ, ৩ কিমি।

বেতাগী ও বামনা শহর এ নদীর তীরে অবস্থিত। বুড়িশ্বর নদী ৪৮ কিমি দীর্ঘ, চওড়া ৩ কিমি। খাকদোন নদ বরগুনা শহরের উত্তরপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিষখালী ও পায়রা নদীর মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪ কিমি, বিস্তার ৪০০ মিটার। এর তীরে বরগুনা জেলা শহর অবস্থিত। বদনিখালি বা বেরা নদী ১১ কিমি দীর্ঘ, প্রশস্ততা ৩০০ মিটার। বদনিখালী নদী ও খাকদোন নদ উভয়ই বিষখালীর শাখা। বিষখালী নদীর আরেকটি শাখা হলতা নদী বামনা উপজেলায় প্রবাহিত যা ৯ কিমি লম্বা, ২০০ মিটার বিস্তার। নদী তিনটি পানি প্রবাহের স্বল্পতার কারণে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে এবং নদীর বুকে চর জেগে উঠছে। এজন্য স্লুইজগেট, কালভার্ট, দখল, অবৈধ বসত, নগরায়ন ভারতের ফারাক্কা বাঁধ, তিস্তা বাঁধ ইত্যাদি দায়ী।

হরিণঘাটা নদী বরগুনা ও বাগেরহাট জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী। এটা গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৃহৎ উপকূলীয় নদী। নদীটি বলেশ্বর নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। বলেশ্বর নদীর পানি বয়ে নিয়ে ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এটি বাগেরহাট জেলা এবং বরগুনা জেলার সীমানা আলাদা করেছে। নদীটি বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা এবং বরগুনার জেলার পাথরঘাটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বলেশ্বর-হরিণঘাটা ৬৪ কিমি দীর্ঘ, গড় প্রস্থ ১ থেকে ৮ মাইল পর্যন্ত।

বুড়িশ্বর বা পায়রা নদী আমতলী-বরগুনার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। এর উৎপত্তি কলসকাঠি পাণ্ডব নদী থেকে। কুমড়াখালী, বড়বগী, পঁচাকোড়ালিয়া, আড়পাঙ্গাশিয়া, আমতলী, চাওড়া ও গুলিশাখালী ইউনিয়নের কোল ঘেষে পায়রা নদী প্রবাহিত। এ নদীর আমতলী পৌর এলাকার দেড় কিমি এলাকায় রয়েছে কংক্রিটের ব্লক। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ দৃশ্য লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে এ নদীর পাড়ে ভ্রমণ পিপাসুদের কোলাহল দেখা যায়। লম্বায় ৯০ কিমি, চওড়া ৩-৪ কিমি। বগি নদী, কচুপাত্রা নদী ও পঁচাকোড়ালিয়া নদী তালতলী-আমতলী উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত। কুকুয়া নদী সর্পিলাকারে বরগুনার বুড়িশ্বর নদীতে পতিত। কুকুয়া-বুড়িশ্বর সঙ্গমস্থলকে খুনকা নদী নামে পরিচিত।

চাওড়া নদীর দৈর্ঘ্য ২১ কিমি, বিস্তার ১কিমি। চাওড়ার ঐতিহাসিক মাটির দুর্গটি চাওড়া নদীকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল। এখন আর নদীর সেই উন্মত্ত প্রবাহ নেই। তবে কালের ইসাদি হয়ে দুর্গটি টিবি আকারে আজও টিকে আছে। গুলিশাখালী নদীর প্রশস্ততা প্রায় ১২০ মিটার, গভীরতা ৫-৬ মিটার। অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩০ বর্গকিমি। আড়পাঙ্গাশিয়া বুড়িশ্বর নদীতে মিলিত। আয়লা নদী দৈর্ঘ্যে ৪ কিমি, বিস্তার ৪০০ মিটার। এটি বুড়িশ্বর নদীর শাখা। এটি চাঁদখালীর নিকট দিয়ে বিঘাই নদীর সাথে মিশে সমুদ্রগামী হয়েছে। চড়কগাছিয়া নদী বুড়িশ্বর নদীতে মিলিত। ঝোপখালী ও গজালিয়া নদী বেতাগী উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত স্রোতধারা। টিয়াখালি নদীর দৈর্ঘ্য ৩৮ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১১০ মিটার এবং প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক টিয়াখালি নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী নং ৩৭।

ঝালকাঠি জেলা

ঝালকাঠি জেলার নদনদী সমূহের মধ্যে রয়েছে গজালিয়া নদী, ধানসিঁড়ি নদী, গাবখান নদ, কুমারখালী নদী, সুগন্ধা নদী, মরা বিশখালী নদী, খয়রাবাদ নদী, বিশখালী নদী, বাসন্ডা নদী, পোনা নদী, জাঙ্গালিয়া নদী, ধানসিড়ি নদী, রাজাপুর নদ, ঝালকাঠি নদী, নলছিটি নদী প্রভৃতি। সুগন্ধা নদীর দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার প্রস্থ ১ কিমি। আমুয়া নদীর দৈর্ঘ্য ৯কিমি, প্রস্থ ৪০০ মিটার। গাবখান নদী বা চ্যানেল অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে খননকৃত। পোনা নদী রাজাপুর উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত। ধানসিড়ি নদী ঝালকাঠি থেকে রাজাপুর পর্যন্ত প্রবাহিত একটি মরা নদী যা বর্তমানে একটি অনাব্য খালে রূপান্তরিত। এর দৈর্ঘ্য ৭ মাইল, প্রস্থ ২০ গজ।

পিরোজপুর জেলা

পিরোজপুর জেলার নদীসমূহের মধ্যে রয়েছে পোনা, বেলুয়া, মধুমতি, তালতলা, কালিগঙ্গা, কচা, সন্ধ্যা, বলেশ্বর, দামোদর, গাবখান, সালদাহা নদী, কাউখালী নদী, সাপলেজা নদী প্রভৃতি। মধুমতি নদী পিরোজপুর জেলার মধ্যে আট কিমি স্থান দিয়ে প্রবাহিত। নাজিরপুরের ঝনঝনিয়া থেকে এটি পিরোজপুরে প্রবেশ করেছে। দেশপ্রসিদ্ধ এ নদীটি বলেশ্বর ও তালতলা নদীতে পতিত হয়ে তার সুদীর্ঘ যাত্রা শেষ করেছে। মধুমতি নদীর দৈর্ঘ্য ১৩৭ কিমি। পোনা নদী ১৫ কিমি দীর্ঘ। ভান্ডারিয়া উপজেলা সদর পোনা নদীর তীরে অবস্থিত। নেছারাবাদ ও নাজিরপুরকে বিভক্ত করে প্রবাহিত হয়েছে বেলুয়া নদী। নদীটি প্রায় ৪০ কিমি দীর্ঘ। কাউখালী বন্দরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান খাল সদৃশ প্রবাহটি একসময়ের চিড়াপাড়া নদী। হুলারহাট নদীবন্দর কালিগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি বলেশ্বর হতে উদ্ভূত। তালতলা নদী নাজিরপুরের মাটিভাঙ্গা ও সাঁচিয়া বাজারের কাছে মধুমতির স্রোতধারা ধারণ করে কালিগঙ্গাতে পতিত। ইন্দুরকানি উপজেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়ে পানগুচ্ছি নদী প্রবাহিত।

বলেশ্বর নদ মাটিভাঙ্গা থেকে শুরু। এটি তুষখালির কাছে কচা নদীর সঙ্গে মিলে মঠবাড়িয়া হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। হুলারহাট বন্দরের কাছে সন্ধ্যা ও কালিগঙ্গার ধারা কচা নামে বলেশ্বর নদীতে পতিত। এটি আন্তর্জাতিক নদীপথ। কচা নদী ৪৫ কিমি দীর্ঘ, ৩ কিলোমিটার প্রশস্ত। বলদিয়া ও স্বরূপকাঠী নদী কচা নদীর উপনদী। মূল সুগন্ধার এক ক্ষীণ প্রবাহ সন্ধ্যা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে কাউখালির কাছে কচা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৫ মাইল, প্রস্থ ১ মাইল। মোঘল আমলে দামোদর নদী পিরোজপুর শহরের ভেতর দিয়ে বলেশ্বর হতে কালিগঙ্গায় প্রবাহিত হতো। বর্তমান দামোদর নদী একটি ছোটো খালে পরিণত হয়েছে।

আযাদ আলাউদ্দীন
বরিশাল ব্যুরো চিফ, দৈনিক নয়াদিগন্ত

বাংলাদেশের বিষখালী বনাম অস্ট্রেলিয়ার জর্জ নদী

তারিকুল ইসলাম তিতাস

'একুল ভেঙ্গে ওকুল তুমি গড়, যার একুল ওকুল দুকুল গেল তার লাগি কি কর ? ও নদী রে... । নদীর এই ভাঙা গড়ার খেলা দেখতে দেখতেই আমি শৈশব থেকে কেশর অতঃপর যৌবনে পদার্পন করেছি। বাকেরগঞ্জে আমাদের নিয়ামতি বন্দরের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে স্মৃতিময় বিষখালী নদী। এই নদীর দুই পাড়েই রয়েছে অসংখ্য লোকের বসাবস। যারা এখানে বাস করে তাদের মধ্যে জেলে এবং কৃষক পরিবারই বেশি। যাদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে এই নদীর উপড় ভিত্তি করেই। এদের মধ্য কেউ রুপালী ইলিশ শিকার করে, কেউ নদীর পাড়ে গরু-মহিষ চড়িয়ে তা থেকে দুধ সংগ্রহ করে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। আবার কেউ কেউ নদীর বুকে জেগে ওঠা চরে লাগিয়ে দেয় সবুজ ধান গাছের চাড়া। আস্তে আস্তে বড় হয়ে সেই সবুজ ধানের চাড়ায়, এক সময় ফলে সোনালী ধান।

মাঝি খেয়া পাড়াপাড় করে যাত্রীদের পৌছে দেয় নদীর এপাড় থেকে ওপাড়ে। এভাবেই চলে বিষখালী নদী পাড়ের মানুষের জীবন জীবিকা।

বিষখালী শান্ত এবং সুন্দর নদী হলেও সব সময় শান্ত থাকে থাকে না এই নদীটি। ঋতুভেদে এর রুপের পরিবর্তন আসে। শীতকালে এই নদীর রুপ যেমন শান্ত থাকে , আষাঢ় শ্রাবণে সেটা পরিবর্তন হয়ে হয়ে যায় অন্য রকম। খুব ছোটবেলায় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নদীতে যাওয়া আমাদের জন্য বারণ ছিল । বিশেষ করে জোয়ারের সময় । কারণ জোয়ারের সময় নদী খুব ভয়ংকর হয়ে ওঠে। দুই কুল ছাপিয়ে পানি উপচে পরে চারদিকে। স্রোতের শক্তি বেড়ে যায় কয়েকগুন। ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীর পাড়ে বেধে রাখা কৃষকের গরু অথবা মহিষের পাল। কৃষকের কান্নায় তখন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে ।

আমরা বিষখালীর যে পাড়ে বসাবস করি তার বিপরীত পাশের চিত্র সম্পূর্ন ভিন্ন। গত তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে ওপাড়ে চলছে ভাঙনের খেলা। এক একটি বছর যায়, ভিটেহারা হয় কয়েকশত পরিবার। শত বছরের ঐতিহ্যে লালন করা বাপ দাদার ভিটে হারানো যে কত কষ্টের সেটা বিষখালীর পশ্চিম পাড়ের মানুষদের না দেখলে বুজা যাবে না । দুপুরের দিকে নদীতে জোয়ার হতে দেখতাম। জোয়ারে অসংখ্য ছোট বড় নৌকা সাদা সাদা পাল তুলে দিত। নৌকার পিছনের দিকে বড় দ্বার বৈঠা ধরে মাঝি গলা ছেড়ে গান গাইত .....

পূবালী বাতাসে... আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানি রে... ।

তখন নদীতে কোন মেশিন চালিত নৌকা বা ট্রলার ছিল না। ছিল না কোন শব্দ বা বায়ু দূষণ । আমরা নদীর পাড়ে বসে মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নি:শ্বাষ নিতাম। এক এক ঋতুতে বিষখালীর রূপ থাকে এক এক রকম। কখনও শান্ত, কখনও ক্লান্ত আবার কখনও ভয়ংকর।

আবার দিনের বেলায় নদীর সৌন্দর্য থাকে একরকম, রাতে অন্যরকম।

নদীর এই ভিন্ন রূপ বা সৌন্দর্য আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। মুগ্ধ হয়েছি দুই ধারের কাশবন আর কাশবনের উপর আকাশের সাধা মেঘের ভেলা দেখে। আমাদের বিষখালী নদীর দুই তীরে অসংখ্য পাখিকে মাছ শিকার করতে দেখা যায়। সবথেকে বেশী দেখা যায় সাদা বক। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বসে যায় বিষখালীর তীরে। আপন মনে মাছ শিকার করে খায় ওরা।

অথচ মাত্র এক দশকের ব্যাবধানে বিষখালীর সেই রুপ, সেই সৌন্দর্যের আর কিছুই দেখা মেলে না। হারিয়ে গেছে নদীর বুকে থেকে সেই সারি সারি পাল তোলা নৌকা। নদীর দুই পাড় ভরাট করে বানানো হচ্ছে সুউচ্চ ভবনসহ নানা রকম স্থাপনা। ইঞ্জিন চালিত নৌকাগুলোর বিকট শব্দ আর দুষিত কালো ধোয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আশে পাশের পরিবেশ। পাখিরা উড়ে চলে যাচ্ছে দূরে কোথাও।

আমার ছোটবেলার স্মৃতিময় প্রিয় বিষখালী নদীর বুকে থেকে পালতোলা নৌকা হারিয়ে গেলেও, হারিয়ে যায়নি নামক দেশটির নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের জর্জ রিভার নামক এই নদীটি থেকে। কর্মসূত্রে প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমি অস্ট্রেলিয়ায় বসাবস করে আসছি। নদী দেখা এবং নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার প্রতি আমার দূর্বলতা যেহেতু ছোটবেলা থেকেই, সেহেতু সময় পেলেই আমি ছুটে চলে আসি জর্জ নদীর তীরে। নদীটি ছোট, সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। ছোটবেলায় বিষখালী নদীর তীরে যেমন অনেক সাদা বক পাখি দেখতাম, তেমনি জর্জ নদীর তীরে দেখা যায় অসংখ্য সাদা রংয়ের গাংচিল। পাল তোলা নৌকাও ভেসে বেড়াতে দেখা যায় এই নদীতে। নেই কোন ইঞ্জিন চালিত নৌকা, নেই কোন কালো ধোঁয়া। নদীর দুই পাড়ে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মুক্ত বাতাসে মন ভরে যায়।

জর্জ রিভারের বুকে পাল তোলা নৌকা, এর সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ- সবকিছুই সম্ভব করেছে এইদেশের সরকার এবং সচেতন জনগন। এদেশের মানুষ সুন্দরের পূজারী। এরা নদী ভরাট করে না। নদীতে কোন ময়লা আবর্জনা ফেলে নদীর পানি নষ্ট কর না।

আমার ছোটবেলায় দেখা নিয়ামতির বিষখালী নদী- অস্ট্রেলিয়ার জর্জ রিভার থেকে কোন অংশে কম সুন্দর ছিল না, বরং বেশিই বলা চলে। শরৎকালে বিষখালীর তীরে কাশবনের উপর সাধা মেঘের ভেলা, আর নদীর বুকে পাল তুলে বয়ে চলা নৌকার সৌন্দর্য, পৃথিবীর অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্যকেও হার মানাত। অথচ আজ সেই সৌন্দর্যের কিছুই নেই।

বিষখালীর বুকে আজ পাল তোলা নৌকার বদলে চলছে ইঞ্জিনচালিত জাহাজ, কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ উজাড় করে দিচ্ছে নদী পাড়ের জঙ্গল এবং কাশবন, ভরাট করে ফেলা হচ্ছে নদীর পাড়। ফলশ্রুতিতে বিপন্ন হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। দেখা দিচ্ছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

প্রকৃতির প্রতি মানুষ যখন খুব বেশী বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে, প্রকৃতিও তখন মানুষের প্রতি বিরুপ আচরণ শুরু করতে থাকে। যার ফলস্বরূপ আজ আমরা দেখতে পাই ঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছাস।

আসুন আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসি, নদীর দুকূলের বনজ সম্পদ রক্ষা করি, নদী ভরাট বন্ধ করে ফিরিয়ে আনি নদীর নাব্যতা। তাহলে হয়ত আবার ফিরে পাব আমাদের হারিয়ে যাওয়া সেই সোনালী অতীত।

তারিকুল ইসলাম তিতাস, বরিশাল বিএম কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী, বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী

উচ্চ রক্তচাপের কারণ

ডা. কে এম জাহিদুল ইসলাম

উচ্চ রক্তচাপ ২ ধরনের একটি হলো প্রাইমারী যা ৯৫ শতাংশ এবং আর একটি হলো সেকেন্ডারি যা ৫ শতাংশ। প্রাইমারী উচ্চ রক্তচাপে সাধারণত কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিডনিতে সমস্যা হলে, হরমোনজনিত সমস্যা হলে, হৃদযন্ত্র থেকে বের হওয়া বড় মহাধমনিতে ব্লক হলে সেকেন্ডারি উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। উচ্চরক্তচাপের কিছু পরিবেশগত কারণ, কিছু জেনেটিক বা বংশগত কারণ ও কিছু চাইল্ডহুড বা শৈশবগত কারণ।

পরিবেশগত কারণের মধ্যে অধিক ওজন, শারীরিক পরিশ্রমে অলসতা, খাবারে লবণের আধিক্য ও অধিক মদ্যপান করা।

শরীরের ওজনের সঙ্গে উচ্চরক্তচাপের সরাসরি সম্পর্ক আছে। হালকা ধরনের ব্যায়াম করলেও উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা কমে। অতিরিক্ত লবণ খেলে শুধু রক্তচাপই বাড়ায় না, ব্রেইন স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়ায়।

খোদ আমেরিকাতে মদ্যপান ১০ ভাগ ক্ষেত্রে উচ্চরক্তচাপের কারণ। অতিরিক্ত লবণ যেমন রক্তচাপ বাড়ায় তেমনি বেশি পটাসিয়ামযুক্ত খাবার এ রক্তচাপ বাড়ানোর প্রবণতা প্রতিরোধ করে। তাই আমাদের লবণযুক্ত খাবার কমিয়ে বেশি পটাসিয়ামযুক্ত খাবার গ্রহণ করা উচিত।

কিছু কিছু ওষুধ বা খাবার আছে যা রক্তচাপ বাড়ায় বা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয় যেমন- মদ্যপান, ইয়াবা বা এমফিটামেন জাতীয় ওষুধ, ডিপ্রেসন কমানোর ওষুধ, কফি পান, নাকের সর্দির ওষুধ, কিছু ভেষজ ওষুধ, কিছু ব্যথার ওষুধ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ওষুধ, কিছু স্টেরয়েড ওষুধে রক্তচাপ বাড়তে পারে।

জন্মের সময় ওজন কম থাকা, অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, অতিরিক্ত মানসিক ও সামাজিক চাপ থাকলেও রক্তচাপ বাড়তে পারে।

ডাঃ কে. এম. জাহিদুল ইসলাম
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এম.এস (অর্থোপেডিক সার্জারী), বিএসএমএমইউ (পিজি হাসপাতাল)

ডা. মোঃ মোর্শেদুল ইসলাম
ডিএইচএমএস ঢাকা
পিজি হোম লন্ডন, ইউকে
রেজিস্টার্ড চিকিৎসক, চর্ম,
ক্যান্সার ও এইডস গবেষক

চেম্বারঃ
মোর্শেদ হোমিও ক্লিনিক
হাসিনা কুঞ্জ, কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোড, বরিশাল।
০১৯৫৩৭০০৮১৮, ০১৭১৭২৭২২২৩

নিরাপদ পানি, নিরাপদ জীবন

পানির সকল মান পরীক্ষিত

বিএসটিআই অনুমোদিত বিশুদ্ধ পানির প্রতিষ্ঠান

মুনাফ পিওর ড্রিংকিং ওয়াটার
বাড়ী # ৩২০, নবগ্রাম রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল

যোগাযোগঃ ০১৭১৯-৩৯৫৮৩৮, ০১৭২২-২০৩৭৭২

লালমোহনের খরস্রোতা বেতুয়া নদী এখন মরা খাল

মো: জসিম জনি

বেতুয়া নদী। খরস্রোতা যে নদী আজ মরা খালে পরিণত হয়েছে। তেঁতুলিয়া নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে ভোলা থেকে লালমোহনের বুক বয়ে চরফ্যাশন হয়ে মেঘনা নদীতে মিশেছে। এ নদীতে চলাচল করতো যাত্রীবাহী লঞ্চ, গয়না ও ট্রলার। লালমোহনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এবং ভোলা থেকে চরফ্যাশন পর্যন্ত যোগাযোগের মাধ্যম ছিলো এ নদী। প্রবল স্রোত উপেক্ষা করে চলাচল করতো সেসব বাহন। নৌকা দিয়ে নদীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পারাপার হতে হতো। স্রোতে ডুবতো কত নৌকা। বেতুয়া নদীর যৌবনের কথা এখনো মনে আছে বেতুয়া সংলগ্ন লালমোহন রায়চাঁদ গ্রামের বৃদ্ধ আলী মিয়ার। তিনি জানান, যখন এ নদীতে লঞ্চ চলতো, তখন তিনি ওই লঞ্চের যাত্রী ছিলেন। বোরহানউদ্দিন, ভোলা ও চরফ্যাশন যাওয়া যেতো এ নদী দিয়ে। বিয়ের যাত্রী, নববধু আনা নেওয়া হতো যোগে। পূর্বে মেঘনা আর পশ্চিমে তেঁতুলিয়া নদীর সংযোগ স্থাপনকারী এ নদীর বুকে এখন ফসল ফলে। গড়ে উঠেছে বসতি। বর্ষার পর বেতুয়া শুকিয়ে যায়। বেতুয়া নদীতে শত শত ভেসাল জাল ও কচুরিপানা থাকার কারণে এখন নৌকাও চলে না। বেতুয়া নদীটি এখন উত্তরে লালমোহন চরভূতা ও ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সীমানা দিয়ে দক্ষিণে রমাগঞ্জ ও লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের সীমানা হয়ে চরফ্যাশনের আসলামপুর ইউনিয়ন পর্যন্ত অস্তিত্ব আছে। এরপর মেঘনায় মিশে গেছে এ নদী। বেতুয়া নদী থেকে এখন খালে রূপান্তরিত হয়েছে। চরফ্যাশনের বেতুয়া লঞ্চ ঘাট এ খালের মুখে। লালমোহন উপজেলার লর্ডহার্ডিঞ্জ এলাকায় বেতুয়া বাঁধ ও স্লুইজ গেট রয়েছে।

যৌবনে বেতুয়ার পানিতে ভেসে গেছে কত ভিটেমাটি, বাড়িঘর ও ফসলি জমি। বেতুয়ার ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে কত মানুষ। কিন্তু কালের বিবর্তনে অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছে বেতুয়া নদী। বেতুয়ায় মাছ ধরে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করত। সেই বেতুয়া আজ শুধুই স্মৃতি, শুধুই মরা খাল। অনেক স্থানে এখনো মরা নদী বেতুয়ার স্মৃতি রয়ে গেছে। এর দুই তীরে কৃষকেরা ইরি ও বোরো ধান চাষ করতেন। কিন্তু বেতুয়ার পানি দিয়ে এখন আর চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বেতুয়া নদী এখন রূপকথার গল্পের মতো। বেতুয়া নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে মাঝিমাল্লারা ভাটিয়ালি গাইতো। পটুয়াখালীর কালাইয়াসহ দূর-দূরান্তের হাটবাজারে মালামাল আনা নেয়া করা হতো। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি কাজে তখন বেতুয়ার পানি সেচ দেয়া হতো। ১৯৪০ সালের দিকে খরস্রোতা বেতুয়ায় বাঁধ দিতে গিয়ে অনেক শ্রমিক মারা যায় বলে জনশ্রুতি আছে। কয়েক বছর লেগেছে এ বাঁধ নির্মাণকাজ শেষ করতে। লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলার বেতুয়া স্লুইজ গেটে গেলে দেখা যায় এ বাঁধের ওপর পাকা রাস্তা করা হয়েছে। বেতুয়াকে স্থানীয় লোকমুখের ভাষায় 'বেউত্তার খাল' বলা হয়। জনশ্রুতি রয়েছে এ নদীতে কুমিরও ছিল।

১৯৪০ সালে মেঘনার মোহনা বন্ধ করে দেয়ার কারণে স্রোতহীন হয়ে পড়ে বেতুয়া নদী এবং ধীরে ধীরে মরে যেতে থাকে নদীটি। খরস্রোতা মেঘনা নদী থেকেই বেতুয়া নদীর সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ১৬২৮ সালে প্রকাশিত রোহিনী কুমার সেনের লেখা বাকলা ইতিহাস গ্রন্থে বেতুয়া নদীর কথা উল্লেখ আছে। সাগর মোহনার বক্ষ ছিঁড়ে দ্বীপরানী ভোলা জেগে ওঠার সূচনা লগ্ন থেকেই বেতুয়া নদীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীর লেখা ভোলা জেলার ইতিহাস গ্রন্থে বর্তমান ভোলা শহরের মধ্য দিয়ে যুগীর ঘোল হয়ে বেতুয়া নদী প্রবাহমান ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে, যা এখন বেতুয়ার খাল নামে পরিচিত। লালমোহন উপজেলার রমাগঞ্জ, জিএম বাজার, অন্নদাপ্রসাদ গ্রামসহ কয়েকটি গ্রাম দিয়ে এখনো বেতুয়ার সরু খাল রয়েছে।

মরে যাওয়ার পর বেতুয়া নদীর যেটুকু অস্তিত্ব আছে তা খনন করার দাবি জানিয়েছেন বেতুয়ার দুই তীরে বসবাসকারী জনগণ। এটাই উপজেলাবাসীর প্রাণের দাবি।

মো: জসিম জনি
সাংবাদিক, লালমোহন, ভোলা।

সংবাদপত্র ও আমি

লিটন বাশার

গত একদশকে দেশের সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। মান উন্নয়ন ঘটেছে সংবাদপত্রের। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী সংবাদকর্মীদের মান বাড়েনি।

এর নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসবে সংবাদপত্রের বিরাজমান ভয়াবহ অস্থিরতা, সাংবাদিকদের চাকুরির অনিশ্চয়তা ও বেতন বৈষম্য। এ সব কারণেই আমাদের দেশের মেধাবী এবং দক্ষ যুবকরা সংবাদপত্রে কাজ করতে আসেন না। যারা এসেছেন, তারা অনেকটা আমার মতই হাসতে হাসতে নেশায় জড়িয়ে পড়েছেন। নেশা মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। এখন অনেকটা গন্তব্যহীন ভাবে বাধ্য হয়েই নেশাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে বেঁচে আছেন। গত একদশক আগেও বরিশাল শহরে সংবাদপত্রের কোনো ভালো অফিস ছিল না। সংবাদকর্মীদের বসে কাজ করার জন্য ভালো চেয়ার, টেবিল ছিল না।

১৯৯৫ সালে দৈনিক আজকের বার্তা আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সংবাদকর্মীদের কাজ করার জন্য একটি সুন্দর পরিবেশের তৈরি করলেও সংবাদকর্মীদের বেতন নামের সম্মানী পড়ে থাকে সেই পুরানো ধারাবাহিকায়। আমি নিজেই সেই অফিসে কাজ শুরু করেছিলাম ৭শ টাকা বেতনে। এর আগের ইতিহাস আরো করুণ, বেতন ছিল ৩শ টাকা। পত্রিকার নাম দৈনিক শাহনামা। টাকা পাওয়া যেত ৫০/১০ টাকা করে। এসব পত্রিকা অফিসে রিপোর্টারের চেয়ে কম্পিউটার অপারেটর এবং পিয়নের বেতন বেশি। এ অবস্থা শুধু বরিশালে নয়। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, জনকণ্ঠ ও যুগান্তর, ইনকিলাব ব্যতীত অন্যকোন পত্রিকা রিপোর্টারদের ভাল বেতন ভাতা তো দূরের কথা নিয়মিত বেতন পরিশোধ করেন বলেও আমার জানা নেই। অথচ রাস্তায় বের হলে হরেক রকম বাহারী পত্রিকা দেখি আমরা দেয়ালে।

ঢাকার অবস্থা

জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে দ্বীপজেলা ভোলা ছেড়ে ঢাকায় গিয়েছিলাম চাকুরির সন্ধানে। দীর্ঘদিন। এই পেশায় থাকার কারণে ঢাকার অনেক সাংবাদিকসহ আমার সুহৃদ বন্ধু বটে। তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতির আশার আলো সন্ধান করতে গিয়ে হোচট খেয়েছিলাম চোরাবালিতে। এক টানা দীর্ঘ আড়াই মাস বেকার জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই করুণ। যে বন্ধুরা আমার দেখা পেলে এক সময় ধন্য হতো তারা আমাকে দেখে বিরক্ত হতে শুরু করল। একটা চাকুরির আশায় ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছি সর্বত্র। কোথায় সাড়া মিলছে না। বরং প্রেসক্লাব আর রিপোর্টাস ইউনিটিতে বেকার সাংবাদিকের ভীড় দেখে আমার মাঝে শংকা বাড়তে থাকে। হঠাৎ একদিন একটা চাকুরি পেলাম দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায়। তাও কোন সাংবাদিক বন্ধুর করুণা কিংবা দয়ায় নয়। চাকুরি দাতা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের এক ইন্সপেক্টর। চাকুরি পেয়ে সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি আমি আস্থা হারালাম। নিজের বাস্তব জীবনে দেখলাম একটি সংবাদপত্রের অফিসে সংবাদকর্মীদের চেয়ে একজন ইন্সপেক্টরের ক্ষমতা অনেক বেশি। তারপরের অবস্থা আরো কঠিন। প্রথম মাসে অফিসের হাজিরা খাতায় নাম উঠল না। বরং শুনলাম নাম উঠানোর জন্য ৬ মাস আগে থেকে আরো একজন কাজ করে যাচ্ছেন। যাই হোক আমার ভাগ্য খুবই ভাল একমাস পরই খাতায় নাম উঠলো। তাও বেতন পিয়নের সমান। এরপরও উপদেষ্টা সম্পাদক আমাকে আশ্বস্থ করলেন আমার চেয়ে ৩/৪ বছর পূর্বে কাজ শুরু করেছেন এমন রিপোর্টারের চেয়ে আমার বেতন ৫'শ টাকা বেশি ধরা হয়েছে। আমি নাকি একটু ভাল রিপোর্টার এ জন্য। অসন্তুষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু বেতন পাচ্ছি না। সহকর্মীরা সবাই হাস্যরহস্যের ছলে এক-দেড় বছর বেতন বকেয়ার কথা বলেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম দৈনিক সংবাদ ও ভোরের কাগজের একই হাল।

প্রতিদিন এ্যাসাইনমেন্ট সেরে সন্ধ্যায় রিপোর্টিং টেবিলে গিয়ে যেসব গল্প শুনতাম তাতে বিষাদে মনটা ভারী হয়ে যেত। কেউ বাসা বাড়া পরিশোধ করতে পারছে না। বাচ্চার বেতন, চিকিৎসা কিংবা একটু একটু ভাল খাবার সংগ্রহে তাদের জীবনে ব্যর্থতা নিত্য দিনের সঙ্গী। আমিও নিজের জীবনে এই হতাশার ভবিষ্যতের আশংকায় জর্জরিত হলাম। কি হবে ভবিষতে। নতুন পত্রিকা বের হওয়ার খরচ পেলেই বায়োডাটার কপি নিয়ে সেখানে দৌড়াই। কিন্তু সেখানে থাকে প্রচন্ড ভীড়। অভিজ্ঞ বেকার সংবাদকর্মী আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা তরুন-তরুণীদের ভীড়ে কখনো কখনো আমি দেখা পাই না নয়া সম্পাদকের। এরকমই একদিন আমার অগ্রজ বরিশালের প্রথিতযশা সাংবাদিক শওকত মিলটন স্ব-শরীরে সুপারিশ নিয়ে গেলেন নতুন ধারার নতুন সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খানের কাছে। নাঈম ভাই আমার বেতন নিয়ে দর কষাকষি শুরু করলেন। এক পর্যায় বাংলাবাজার পত্রিকার চেয়ে একহাজার টাকা কম বেতনে আমি কাজ করতে রাজী কিনা জানতে চায় নাঈম ভাই। বিষাদে আমার মনটা ভারে যায়। নাঈম ভাই গণমাধ্যম বিষয়ক একটি এনজিওর হর্তাকর্তা। সর্বদা সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন তিনিই আমাকে বেতন দিতে চান একজন পিয়নের চেয়ে কম। অবশ্য নাঈম ভাইকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সংবাদপত্র জগতের

এরকমই। বাংলাবাজার পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক (মালিকের বোন) একদিন রিপোর্টিং সেকশনে চিৎকার করে বলেছিলেন, বেশি বেতন বেতন করবেন না। যার খুশী কাজ করবেন নয়তো চলে যান। ২ হাজার টাকায় রিপোর্টার পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করা মেধানী ছাত্র কাজ করতে আগ্রহী। তিনি খুব সত্যি কথা বলেছেন। কোটি বেকারের এ দেশের চাকুরি যখন সোনার হরিণ তখন সংবাদপত্রের গ্লামার জগতে প্রবেশ করতে কারো কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় এটাকে পেশা হিসেবে নেয়ার পর। এজন্য বেকারত্বের পাশাপাশি দায়ী আমাদের সংবাদপত্রের জন্য সুষ্ঠ নীতিমালার অভাব। বহুল প্রচারিত পত্রিকার মালিকরা আজ বেতন দিতে পারছে না আর শত শত আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেসের মালিক ডিএফটি'র দুর্নীতির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, কলাগাছ থেকে বটগাছ, বটগাছ থেকে তারা এখন জোড়া বটগাছ হয়েছে। আলু, পটল, সাবান ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কালো টাকার মালিক রাজনীতিবিদ সবাই সংবাদপত্রের মালিক হয়েছেন। এদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠা কতিপয় সংবাদকর্মী বেতন না পেয়ে বেপরোয়া সংবাদ পরিবেশক হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকরা আজ আর সংবাদপত্রের মালিক হতে পারছে না। ঝুঁকির কারণে মেধাবী উদীয়মান যুবকরা পেশার দিকে এগিয়ে আসছে না। সর্বত্রই বেতন বৈষম্য আর অনিশ্চয়তা। এ ধারা অব্যাহত থাকলে সংবাদপত্রের মান উন্নয়নের পরিবর্তে নিম্নমুখীই হওয়ার আশংকা রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

বরিশাল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাক বরিশাল অফিসের সাবেক ইনচার্জ মরহুম লিটন বাশারের এই লেখাটি ২০০৪ সালে ম্যাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)'র পক্ষ ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে ২০০৪ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ থেকে নেয়া।

বরিশাল: জনপ্রিয় ফেসবুক গ্রুপ 'মোগ সুন্দার বরিশাল'র উদ্যোগে নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে (বেলস্ পার্ক) ২৫ অক্টোবর শুক্রবার বিকেলে রক্তদাতা সংগ্রহ ও ফ্রি ব্লাড গ্রুপ নির্নয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গ্রুপের সভাপতি মো. আছলাম, সাধারণ সম্পাদক এস এম রেজা হাসান, প্রতিষ্ঠাতা এডমিন সাদ্দাম হোসেন বাপ্পী, দপ্তর সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম সহ গ্রুপের এডমিন ও বিপুল সংখ্যক সদস্য কর্মসূচিতে অংশ নেন।

সত্য প্রকাশে অবিচল

রূপালী বার্তা

২৪ ঘণ্টা সংবাদ পেতে ভিজিট করুন

www.rupalibarta.com

যোগাযোগ:

বরিশাল অফিস: রাবেয়া মঞ্জিল, ৬২/৫৬, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল। ০১৩১৮-২৪২২৭৬

মুলাদী অফিস: জেবুল ম্যানসন (৩য় তলা), সদর রোড, মুলাদী, বরিশাল। ০১৮১৩-১৩০৫১৮

প্রধান উপদেষ্টা

প্রফেসর ডা. সৈয়দ জাহিদ হোসেন

প্রকাশক

ডা. কাজী তৌকিয়া রহমান (রূপা)

সম্পাদক

মো. জিয়াউল আহসান খান (সিপু)

পর্যটক আসলেই ছুটে যান তারা...

জাকিরুল আহসান

সমুদ্র তীরে নামতেই দ্রুতবেগে সামনে আসলেন এক যুবক, তুলবেন... ছবি তুলবেন? প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। 'না' উত্তর পেয়ে চলে গেলেন আরেকজনের কাছে। গায়ে হলুদ টি-শার্ট, পরনে কালো রংয়ের ট্রাউজার আর হাতে বেশ দামি ক্যামেরা। বুঝতে বাকি রইলো না তিনি একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার।

এরকম একই পোশাকে অসংখ্য যুবককে দেখা গেল সাগরকন্যা কুয়াকাটায়। তারা সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যখনই কোনো পর্যটক আসছেন, তখন-ই ছুটে যাচ্ছেন। সম্মতি পেলেই লেগে যান ছবি তুলতে। তবে কেউ কেউ তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন, ছবি তুলছেন নিজেদের মোবাইল দিয়ে। যখন হাতে হাতে স্মার্টফোন তখন কেমন চলছে তাদের এই পেশা?

কথা হলো কুয়াকাটার চরগদামোড় এলাকার বাসিন্দা জামাল হোসনের সঙ্গে। তিনি একবছর আগে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তার কাছে পেশাটা সখের নয়, কিছু করে খেতে হবে তাই করছেন।

জানান, শীতের দিনে পর্যটকদের আনাগোনা বেশি থাকে, তাদের আয়-ও বেশি হয়। এখন বর্ষা, তাই পর্যটক নেই বললেই চলে। যারা আসেন তাদের ছবি তুলতে এত লোকের প্রয়োজন হয় না। তাই এসময়টাতে আয় অনেক কম, মনটাও খারাপ থাকে।

তিনি বলেন, আগে ইনকাম করতাম দিনে ১৫শ থেকে ২ হাজার টাকা। কোনো কোনো দিন হাজার টাকা আয়ের রেকর্ডও আছে। এখন দিনে আয় হয় মাত্র ৫শ টাকা, বড় জোর এক হাজার টাকা। সারাদিন সাগরের তীরে থাকি, দুপুরে খেতে হয় আবার সরাদিনে একটু চা-পানিওতো খেতে হয়। তাতে খরচ হয়ে যায়, ঘরে কিছু নিতে কষ্ট হয়ে যায়।

এখনতো মোবাইলের যুগ, নিজেরাই ছবি তুলতে পারে তাহলে আপনাদের দিয়ে তোলাবে কেন? বলেন, মোবাইলের কারণে আয় কিছুটা কমলেও খুব বেশি কমে যায়নি। যত মোবাইলই থাকুক, ক্যামেরার মতো ভালো ছবি আসে না। আর যারা ঘুরতে আসেন তারা দলের সবাই একসঙ্গে তুলতে হলে আমাদের দরকার হবেই।

আরেক ফটোগ্রাফার আবদুর রহিম জানান, তিনি এই পেশার সঙ্গে জড়িত ১০ বছর পর্যন্ত। তার বয়স যখন ২২ বছর তখন এই পেশায় নেমে পড়েন। তারপর থেক আর অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেননি। এ পেশার প্রতি একটা টান তৈরি হয়েছে তার।

কুয়াকাটা সমুদ্র বন্দরে ছবি তোলেন এমন বেশ কয়েকজনের সঙ্গে মুক্তবুলির এই প্রতিবেদকের কথা হয়েছে। তাদের মধ্যে ফারুক, রিয়াজ ও জাকারিয়া জানিয়েছেন, মূল আয় হয় যখন পর্যটকরা গোসল করেন, কারণ তখন নিজেরা নিজেদের ছবি তুলতে পারেন না, তখন ফটোগ্রাফার লাগবেই। তবে তাদের সমস্যা একটু হয় বিদেশি পর্যটকদের ছবি তুলতে গিয়ে। কারণ এখানকার বেশিরভাগ ফটোগ্রাফারই বিদেশিদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। ফারুক বললেন, আমরা চালাইয়া নেই, বিদেশিদের ইশারায় বুঝে নেই তারা কিভাবে ছবি তুলতে চান, এরপর ছবি তুলি।

তারা জানান, এখানে যারা ছবি তোলেন তাদের নিয়ে একটি সমিতি রয়েছে। তারা সবাই ওই সমিতির সদস্য। সদস্য হতে জমা দিতে হয় ৩ হাজার টাকা। আর সপ্তাহে জমা দিতে হয় ৫০ টাকা। সদস্য হওয়ার পর হলুদ টি-শার্ট নিতে হয় ৩শ টাকা দিয়ে। যাতে সবাই চিনতে পারেন তিনি নির্ধারিত ফটোগ্রাফার। ছবি তোলারও নিয়ম আছে- ফটোগ্রাফাররা প্রথমে অনেকগুলো ছবি তুলেন। এরপর ভালোগুলো বেছে নিতে পারেন পর্যটকরা। এক্ষেত্রে যদি মেমরি কার্ডে নেয়া হয় তাহলে ছবি প্রতি দিতে হয় ১০ টাকা। আর যদি প্রিন্ট করে নেন, তাহলে প্রতিটি ২৫ টাকা। খুব কম সময়ের মধ্যেই তারা ছবি প্রিন্ট করে দিতে পারেন।

বিষয়টি নিয়ে মুক্তবুলির এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হয় কুয়াকাটা ফটোগ্রাফার সমিতির সভাপতি মো. আল আমিনের সঙ্গে। তিনি জানান, তাদের সদস্য ১২০ জন। আর সমিতির মূল কাজ হলো পর্যটকদের সঙ্গে ফটোগ্রাফারদের কোনো ঝামেলা হলে তা মিট করে দেয়া বা কোন সদস্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, বছরে একবার বিনোদনের জন্য পিকনিকের আয়োজন করা।

জাকিরুল আহসান, বার্তা সম্পাদক, রূপালী বার্তা ডটকম

নদী

নয়ন আহমেদ

একটা আসবাবপত্রের অভ্যন্তরে-
একটা বহুভুজী শয্যার উৎসবে-
একটা নিবিষ্ট রান্নাঘরের প্রত্ন শৈশবে-
একটা চিরুনি করা খাবার টেবিলে-
নদী ঝুলে আছে ঔজ্জ্বল্য নিয়ে।
আর প্রবাহিত হচ্ছে
ঔদার্যে
গৌরবে
একাগ্রতায়
কোমলতায়
মমতারসে আকাঙ্ক্ষায়।

আমি দেখতে পেয়েছি একটি নদী
আমার সার্বক্ষণিক চৈতন্যে।
আমি নদীর মতোন প্রযত্ন সভ্যতা
নির্মাণ করি।

জীবন্ত কফিন

রহমান সোহেল

গহিন অরণ্য যেথা ডাকে ক্ষণে সুক পাখির ছাও
শুনতে পাবে তবু দেখবে না কিছু যদি হেথা যাও

জিজ্ঞাসিবে জনে জনে কী খবর আছে তার মনে
ভয়ার্ত পথিকের দল ছোটে কে কার কথা শোনে

নগুরে নগরদ্বারে কোটে মাথা ঢলকানো যানজটে
রুপোন্মত্ত রুইতন ভাসাবে স্বপন উড়াল সড়কে

সজ্জন সওয়ারি বিশেষত প্রদমিত ফলোপদায়ক
মদমত্ত মৎসরী নিরন্ত উৎসবে মণিকাঞ্চনযোগ

ফাঁকিজুকি, শঠতা, ফুসমন্তরে মত্ত ফেরেববাজ
নির্বাসনে সুবচন, মঞ্চাসনে যুদ্ধোন্মাদ যুবরাজ

বলহীন, অমেরুদণ্ডীর ফোলাফাঁপা জলদোষে
জীবনযাপনে বিপর্যয়, ভোজবাজি অবশেষে

বুটাঘাতে রক্তাক্ত হরিকেল, সমতট অন্তহীন
পুণ্ড্র, বঙ্গ, চন্দ্র, বরেন্দ্র এখন জীবন্ত কফিন।

হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

(ভোলার শহীদ'দের স্মরণে)

মোহাম্মাদ এমরান

যতসব ইঁদুর ছানা তুলছে ফণা-
ঐ দেখো ঐ হিংস্র পদে আর্মবনে
তোরা সব থাকবি বসে নিঝুম হয়ে-
আর কত কাল ঘরের কোণে?

ওরে ও পাপিষ্ঠরা করবি যদি লড়াই আজি-
আয় ছুঁটে আয় সমান তালে
দেখি তোরা পারিস কতো আশিষ যতো-
বীর সেনানী লড়বে এবার আক্র ফেলে।

ভীরু তোরা কাপুরুষ তাই চালাস গুলি-
খালি হাতের জওয়ান পরে
নাই কিরে ভয় মরতে হবে যেতে হবে-
জবাব খানি দিতেই হবে দূর ওপারে।

দেখো ঐ শয়তানের দল আসছে তেড়ে-
নগ্ন পদে খ্যামটা নেচে
আজ তোদের দেবোই জবাব নিবোই হিসাব-
পারবি না তো যেতে বেঁচে।

এভাবে আর দেবো না ছাঁড়বো না তো-
মানবতায় হেলায় দুলায়
মুচলেকা তো দিতেই হবে নেবো আজি-
হিসাব সবি পিষে তোদের পায়ের তলায়।

হৃদয়ের রক্ত আজি টগবগিয়ে-
ফুটছে দেখো গগণ ভেদি
হবে না ক্ষমা তোদের দিবোই সাজা-
প্রাণটা আজ যায়গো যদি।

যতসব তরুণ যুবক নর নারী-
আয় ছুটে আয় খোদার রাহে
বাঁচতে হলে লড়তে হবে তীরখানি আজ-
বিঁধতে হবে বাতিলের ঐ হিংস্র দেহে।

নারী

জিনাত তামান্না

সকাল দূপুর যেই নারীটি
রাঁন্না ঘরে পুড়ছে রোজ,
ভোজন রসিক পুরুষ তুমি
সেই নারীর কি রাখছো খোঁজ?

এটায় লবন কম হয়েছে
ওটায় মরিচ খুব বেশী!
তোদের এতো ভুল কেনো হয়
বলতে পারিস কালো কেশী?

খাচ্ছে কি রোজ ঘুমায় কোথায়
নাইতো জানার ইচ্ছে বোধ,
একটু হলেই তুলছো কঠিন
বিরাট রকম ভুলের শোধ!

পুরুষ তুমি হাজার কতো
নিত্য নতুন খুঁত ধর,
খুন্তি হাতে নাও তো দেখি
রাঁধুনী তুমি কতো বড়!

রাঁন্না করা বাসন মাজা
ঘর মোছা আর কতো কাজ!
কাপড় ধোয়া ঘর গোছানো
ছোটো মেয়ের নানান সাজ।

এমনি করেই হিসেব ছাড়া
কাজের মাঝে হায়!
তোমার ঘরের সেই নারীটির
সূর্য ডুবে যায়।

একটি কথাই বলছি পুরুষ
তোমায় শোনো না,
তোমার ঘরের অর্ধাঙ্গিনী
তোমার দাসী না।

ভালোবেসে যায় কেনা যায়
কঠিন মনও শোনো,
তবে কঠোর হয়ে নরম মনের
ঘৃণা কেনো কেনো?

মুক্তবুলি ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য মূল্য তালিকা

◆ কভার শেষ পৃষ্ঠা (চার কালার)	৫,০০০/-	◆ ভেতরের পাতায় অর্ধপৃষ্ঠা (সাদাকালো)	১,০০০/-
◆ কভার ইনার (চার কালার)	৩,০০০/-	◆ ভেতরের পাতায় কোয়ার্টার পৃষ্ঠা (সাদাকালো)	৫০০/-
◆ ভেতরের পাতায় এক পৃষ্ঠা (সাদাকালো)	২,০০০/-		

মুহাম্মদ মামুন বিল্লাহ'র দুটি ছড়া

বরিশালের নদী বৃত্তান্ত

ধান নদী খাল এই তিনে হয় সেই জনপদ বরিশাল
নদীর যেন জাল বিছানো চোখ ফেরালেই তরী পাল
পূর্বে তাহার মেঘনা নদী কুলভাঙানী নামে বয়
ভোলাকে তার পাশে রেখে ডানে কিবা বামে বয়।

মেঘনা নদীর তেজি মেয়ে তেঁতুলিয়ার বুকে ঢেউ
তেজ দেখিয়ে দোলায় বেণী কাঁদবে কি তার দু:খে কেউ?
মেঘনা এবং তেঁতুলিয়া মুখ লুকালো সাগরে
যেতে যেতে দু কুল ভাঙে ডাক দিয়ে কয় জাগো রে।

আড়িয়াল খাঁ পাঠাল তার একটা তেজি মেয়েকে
তার রূপে কে মুগ্ধ হলো রইল উদাস চেয়ে কে?
কার কবিতায় উঠল ফুটে তেজি মেয়ে ধানসিঁড়ি
ঝালকাঠী চিনতে গেলে এই নদীতে পান সিঁড়ি?

তেঁতুলিয়ার ছোট্ট মেয়ে লোহালিয়া কই গেল?
সাপের মতো একে বেঁকে পটুয়াখালীর খই খেল!
ছোট্ট হলেও অনেক তেজি তার যোগাযোগ সাগরে
রূপে গুণে অনেক সেরা পারলে মনে দাগো রে।

দূর সাগরে সূর্য ডোবায় সন্ধ্যা নামে ধরাতে
তারপাশে এক কীর্তনখোলা মনটা খারাপ করা তে
ফিরতে হলো বরিশালে সন্ধ্যা নদীর কুল ঘেষে
ইলিশা আর কালিজিরায় যাচ্ছে টগর ফুল ভেসে।

বিষখালী আর পায়রা নদী হরিণঘাটার মোহনা
মাটির গন্ধে দারুণ মোহ অন্য কিছুর মোহ না
ধানসিঁড়িতে আবার আমি আসব ফিরে সেই বেশে
খুব সহজে চিনবে আমায় আপন করে যেই বেশে।

আবরার

এনামুল খান

দাতাল শুয়োরের বিষাক্ত ছোবলে কালচে
নিথর শরীরে শুয়ে আছে আবরার,
এ বাংলার জমিনে এ করুণ দৃশ্য দেখে
বুক ফাটা বোবা কান্নায় বাক রুদ্ধ হবেনা কার ?

হে নরকের কীট , হে বুনো শুয়োরের দল,
আমরা শত আবরার নই মৃত্যুর ভয়ে ভীতু,
যদিও দূরে আছি, মৃত্যু হাতে নিয়ে বাঁচি তবু
তোদের মুখে ছুড়ে দেই দলা দলা থু থু ।

আকাশের অপমৃত্যু

ট্রিগার টেনে করলে গুলি মানুষ মরে যেমন করে
তেমন করে করলে গুলি কেউ কি জানো আকাশ মরে?
হিরোশিমায় যখন বিকট শব্দ করে ফুটল বোমা
কত্ত মানুষ মরল পুড়ে সেই কথা কি জানো ও মা?

কিন্তু আকাশ রইল ঠিকই যেমন ছিল তেমন করে
নিকষ কালো অন্ধকারে আকাশ সেদিন আপন ঘরে
খুব কেঁদেছে হাহাকারে মানুষ মরার ব্যথার নীলে
কিন্তু আকাশ মরল না তো সকল ব্যথা নিয়েও দিলে।

উৎপাদনের কল চালিয়ে তোমরা যখন হত্যা করো
সবুজ বনের বৃক্ষরাজি কালো ধোঁয়ার রাজ্য গড়ো
মরন গ্যাসের নির্গমনে কালো ধোঁয়ার তীব্র বিষে
আকাশ কভু মরল না তো রইল তো সেই প্রাণেই মিশে।

কিন্তু সবুজ শ্যামল ছায়ায় মায়ায় ঘেরা একটি দেশে
বিবেক বেচে সোনার ছেলে পশুর অধম মানুষ বেশে
তারায় ভরা একটি আকাশ রাত গভীরে খুব পিটিয়ে
এক নিমিষে শুইয়ে দিল নোংরা মনের আশ মিটিয়ে।

যেই আকাশে তারার আলোয় স্বপ্নে বিভোর একটি ছেলে
টেলিস্কোপে তারার খবর রাখছিল বেশ দু'চোখ মেলে
তেপান্তরেও শেষ হতো না সেই আকাশের নীলের সীমা
যেই আকাশের গল্প বলে খুব খাওয়াতো তার দাদীমা।

বাবার আকাশ মায়ের আকাশ ভাইয়ের আকাশ থুবড়ে পড়ে
শপাং শপাং আঘাত খেয়ে রাত গভীরে রইল মরে
বনের পাখি মনের পাখি সেই রাতে আর গান না করে
খুব বিষাদে কষ্ট পেয়ে ডুকরে ওঠে কান্না করে।

AJ
নুরুল আমিন (এম.এ)
স্বত্বাধিকারী
গহনার জগতে এ শতাব্দির বিশ্বাস
আমিন জুয়েলার্স
অরিজিনাল ২১, ২২ ক্যারেটের স্বর্ণ ও ডায়মন্ডের গহনা নিজস্ব টন্স মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষা করে বিক্রি করা হয়।
১২, এ. কে. স্কুল মার্কেট, হেমায়েত উদ্দিন রোড, বরিশাল
০৪৩১-২১৭৪৯৯৬, ০১৭১১-৩৫৬৮৭৯, ০১৯৮১-১১৪১৮১

নদীর তীরে শৈশব

পলি ইসলাম

ছোট্ট নদীর বাঁকা পথে
আমার শৈশব মাখা
সে নদীর-ই স্মৃতি আজও
মনের মাঝে রাখা।

পরলে মনে নদীর ছবি
ছুঁটতাম সেথা একা,
স্বচ্ছজলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
লাগতো না আর একা।

নদীর তীরে নানান পাখি
কিচিরমিচির করতো,
ছুঁটলে তাদের পিঁছু তারা
আকাশ পথে উড়তো।

নদীর তীরে রাশি রাশি
সাদা কাঁশফুল,
মাঝে মাঝে প্রবল ঢেউয়ে
ভাঙ্গতো নদীর কূল।
জেলে ভাইরা মাছ ধরে
তুলতো তাদের নাঁয়ে,
মাঝি সেথা মনের সুখে
ভাটিয়ালী গায়।

নদীর বুকে নৌকার সারি
পালতোলা ঐ নাঁয়,
ইচ্ছে করে ছুটে যেতে
আমার সোনার গাঁয়।

কেমন সভ্যতা

মারজান ইসলাম

সভ্যতা শুধু আকাশচুম্বি
অট্টালিকার সারি?
সভ্যতা শুধু জনমানবের
মেট্রোরেলেই পারি?

সভ্যতা খুঁজি নানা কন্সট্রাকসনে
নানা সমাবেশ নানা আয়োজনে
বিস্মৃত মোরা কানাগলি গুলো
দীর্ঘশ্বাসেই ভারী।

অনুভূতি নেই কলুষতা ঘেরা
শিক্ষানিবাসে
নিপতিত হয় সত্য বিবেক
হিংস্র গ্রাসে
তবুও সবাই মঞ্চে দাড়িয়ে
দেশপ্রেম বুলি ছারি।

নদীর তীরে শৈশব এসো সুখের পাহাড় গড়ি

মোশাররফ মুন্না

এসো বন্ধু এসো সুন্দর সবুজের ঠিকানায়
গড়ে তুলি আলোর আকাশ
এসো সুখের ঘুড়ি উড়াই সুনীল ঐ নিলীমায়
জড়িয়ে গায়ে সুখের বাতাস

এসো বন্ধন দৃঢ় করি সুখের আবাস গড়ে তুলি
মুক্ত কোলাহলে মাতি সবাই
এসো স্বপ্নে দেখা সেই সুন্দর আবির ছড়িয়ে
সাম্যের গান গেয়ে গেয়ে যাই।

এসো সুখের সাগর ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচাই মরুদ্যান
হাসুক সুখে অসহায় গরীব প্রাণ
এসো সুখের পাহাড় নির্মাণ করি একটু সহায়তা
গানী মুছে ঝরুক হাসির ঘ্রাণ।

এসো রৌদ্র স্নানে পৃথিবীকে বিশুদ্ধ করে গড়ে তুলি
নীলাকাশের নীলে নীলাভ্রিত হোক মানবতা
এসো নির্মাণ করি পৃথিবীর ভঙ্গুর ছাদ সততা দিয়ে
জেগে উঠুক আবার হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা।

এসো বাগান সাজাই সুন্দর সত্য মেধাবী মনন দিয়ে
দেশটা করবে এরাই সমৃদ্ধ
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে গড়বে নতুন বিশ্ব
মুক্তহবে জনপদ অবরুদ্ধ।

এসো উন্নতমানের চাষি হই আবাদ করি উজ্জলতার
সবাই হবো প্রস্তুতকারক স্বপ্ন সফলতার
এসো আমরা হবো গোলাবারুদ অঙ্কুরেই বিনাশকারী
আছে যতো জীবন গল্প বিফলতার।

বরিশালের নদী

জিল্লুর রহমান জিল্লু

জালের মতো ছড়িয়ে আছে, বরিশালের নদী
তেঁতুলিয়া, আড়িয়াল খাঁ, বইছে নিরবধি।
কালিজিরা, কালাবদর, আছে আন্ধারমানিক
দক্ষিণেতে বঙ্গোপসাগর, ধু ধু চারদিক।

খরস্রোতায় বাড়ি-ঘর, ভাঙ্গছে মেঘনা নদী
আগুনমুখায় পরলে নৌকা, উল্টে যায় গদি।

শেরে বাংলার বাল্য স্মৃতি চাখার, সাতুরিয়া
দোয়ারিকা-শিকারপুর চলত গাড়ি টানাফেরি দিয়া।

জীবনানন্দের ধানসিঁড়ি, সুগন্ধা, গাবখান
উজান গাঙ্গে মাঝিরা গায়, ভাটিয়ালি গান।

লোহালিয়া, গলাচিপা, বিষখালী ছৈলার চর
নদী ভাঙ্গা মানুষগুলো, কাশিপুরে বাঁধছে ঘর।

কীর্তনখোলায় লঞ্চের ঘাটি, প্রাণের শহর বরিশাল
রেকর্ড থেকে হারিয়ে গেছে ছোট-বড় জেল খাল।

ভীমরুলীতে পেয়ারা হাট, সন্ধ্যা তীরে কাঠ
টরকি নদী ঘিরে আছে, সকল পণ্যের হাট।

বলেশ্বর, কচা দিয়ে, চলত পানশী, ডিঙ্গি, গয়না
বৈশাখ এলে নৌকা বাইচ, এখন আর হয় না।

ইলিশাতে ইলিশ মাছ, সমুদ্রবন্দর পায়রা
আগের সেই গ্রোত নেই, শুকিয়ে গেছে খয়রা।

দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে, খরস্রোত, নাব্যতা
পরিবেশের সাথে সাথে, হারিয়ে যাচ্ছে সভ্যতা।

www.speedsolution.com.bd
Speed Solution
Professional IT Service Provider
Laptop-Desktop-Accessories
Network Solution & Automation
CCTV Camera, Security Surveillance
Sales, Servicing & Regular Maintenance
Web & Software Solution
143 Sadar Road (In Front of Circuit House) Barishal.
01701-297729, 0431-63304
ceo.speedsolution@gmail.com

‘মুক্তবুলি’
পুরাতন সকল সংখ্যা পেতে চাইলে
নিম্নোক্ত মোবাইল নম্বরে
যোগাযোগ করুন
০১৭১২-১৮৯৩৩৮

উপমহাদেশের শিল্প-সাহিত্যে কি ক্ষয়িষ্ণুবাদ ধরা দিচ্ছে?

শফিক মুন্সি

১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত আইরিশ থিয়েটার অ্যাবি থিয়েটার (Abbey Theatre) তৎকালীন উপনিবেশবাদের প্রধান রক্ষাকর্তা ইংল্যান্ডের বুকে জাতীয়তাবাদের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস ও লেডি গ্রেগরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ওই থিয়েটারের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পাশ কাটিয়ে আইরিশ অভিনেতা - অভিনেত্রীদের মাধ্যমে, আইরিশ বিষয় অবলম্বনে, আইরিশ নাটক পরিবেশন করা। ওই সময়ের শিল্প-সাহিত্য জগতে এই সিদ্ধান্ত আমূল বদলে দেয় বিভিন্ন আঞ্চলের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি। সংক্ষেপিত সংস্করণে ওই জাতীয়তাবাদী শিল্প - সাহিত্যিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে ইংরেজ শাসনে বিপর্যস্ত বিভিন্ন কলোনিগুলোর শিল্পী-সাহিত্যিকদের মাঝেও। এই উপমহাদেশও সেই শৈল্পিক জাতীয়তাবাদি ঢেউ থেকে নিস্তার পায় নি। এ অঞ্চলের সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতেও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলো অ্যাবি থিয়েটার থেকে উচ্ছলিত শিল্প - সাহিত্যিক জাতীয়তাবাদের ফুলকি। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত একদল আধুনিক তরুণ শিল্পী - সাহিত্যিকেরা সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের কর্ম চেতনাগত দিক দিয়ে আইরিশ থিয়েটারের রূপান্তর হলেও সৃষ্টিশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে ছিল অনুপম ও অপ্রতিম। ওইসব অনন্য সৃষ্টিই ভিত্তি গেড়েছিল নিজেদের আপন সংস্কৃতিকে প্রসারিত করা মৌলিক সাহিত্য রচনার। যেসব রচনা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হওয়াও শুরু করেছিলো, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তিকে উল্লেখ করা যায়।

তারপর গঙ্গা - যমুনা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক পানি, সাহিত্যের ধারাতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। সংস্কৃতিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে ছাপ ফেলে বিশ্ব বিভূঁই জয় করা শুরু করেছিল এই উপনিবেশিক অঞ্চলের শিল্প - সাহিত্য সেটা খানিকটা কি ম্লান হয়ে গেছে? এর উত্তর দেবে সাহিত্য বোদ্ধারা। আমার মতো সাধারণ, একটু সচেতন মানুষেরা শুধু দেখছে আকাশ সংস্কৃতির কারসাজি হোক কিংবা মেধার প্রমাণ না রাখতে পারা হোক যেকোনো কারণেই শিল্প- সাহিত্যের নামে যেসব বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা শুধু বাংলাদেশ কেন এই সম্পূর্ণ উপমহাদেশের আপন কোনো কিছু না। ধার করা জীবন চিত্র বর্তমান গল্প, কবিতা, গান কিংবা সর্বোচ্চ শৈল্পিক মিশ্রণ খ্যাত চলচ্চিত্রে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে তাতে শুধু অশ্লীলতা আর অসুস্থ চেতনার প্রচার করা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে ভাববার সময় এসেছে। আমার মনে হয় খুব বেশি উদাহরণের দিয়ে জিনিসটা বোঝানোর দরকার পড়বে না। সামান্য একটার উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। আমাদের সবাই (বিশেষ করে তরুণ শ্রেণি) নেটফ্লিক্সের স্যাকরেড গেম নামক সিরিজটির সঙ্গে পরিচিত। সেখানে যেমন জীবন যাপন কে তুলে ধরা হচ্ছে সেটা কি আদৌ আমাদের পুরো ভারতবর্ষের কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে সত্যিকার অর্থে মিলে যায়?

আমি এখানে স্যাকরেড গেমস এর কথা তুলে ধরলাম আর্ট (শিল্প) এর সকল ধরনের প্রকারকে নির্দেশ করার জন্য। কারণ পৃথিবীতে যত ধরনের কলা আছে (চিত্র, অভিনয়, গান ইত্যাদি) তার সবকিছুই একসঙ্গে প্রকাশ পায় বর্তমান চলচ্চিত্র শিল্পে (আমি চলচ্চিত্র বলতে সকল কলার একসঙ্গে ভিডিওগ্রাফি বোঝাতে চেয়েছি এবং স্যাকরেড গেমস সিরিজটিকে যুক্তির খাতিরে চলচ্চিত্র হিসেবে তুলনা দিলাম) । শিল্পে (আর্ট : চলচ্চিত্র, গান, কবিতা ইত্যাদি) এই সময়ে যতটুকু মাদকের অপব্যবহার, যৌন অনাচার, মানবিক সম্পর্কের বিকৃতি দেখা যায় তা কি সত্যি আমরা ধারণ করি? এর উত্তর পাঠকদের আগে আমিই দিয়ে দিচ্ছি, না, আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে এবং প্রত্যাহিক জীবন অভ্যাসে স্যাকরেড গেমস কিংবা ওই ধরনের কোনো শিল্পকর্মে প্রচারিত অতিরঞ্জিত বিষয়গুলো ধারণ করি না। কিন্তু এসব শিল্প - সাহিত্যই তো বর্তমানে জনপ্রিয় ও ব্যবসা সফল! লোকজন মনের ক্ষুধা মেটাতে বিনোদনের বিষয়বস্তু হিসেবে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ওইসব অশ্লীল, অতি মাদকতা আর অনৈতিক সম্পর্কে ভরপুর কনটেন্ট (শিল্প- সাহিত্য) গুলোর ওপর। এর কারণ আসলে কি হতে পারে?

কলাকৈবল্যবাদ (Estheticism) ও ক্ষয়িষ্ণুবাদ (Decadence) নামে দুটো বিষয় আছে বৈশ্বিক শিল্প - সাহিত্য জগতে। এই দুটো বিষয়ে কঠিন কঠিন বক্তব্য জাহির করে দু একজন অতি জ্ঞান পন্ডিতেরা তাদের দাপট দেখানোর অবিরত চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে আমি সহজভাবে এই দুটি বিষয় নিয়ে একটু বলবো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপে যে কলাকৈবল্যবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে তার দার্শনিক প্রাণকেন্দ্র ছিল ফ্রান্স। এর গোড়া দেখা যায় কান্ট সাহেব প্রস্তাবিত জার্মান তত্ত্বে। বিখ্যাত মার্কিন কবি এডগার এলেন পো 'দি পোয়েটিক প্রিন্সিপাল' লিখে জানান দেন তিনিও এই দলে। কলাকৈবল্যবাদের প্রধান বক্তব্য ছিল - 'আর্টের সঙ্গে বাস্তব ইউটিলিটির কোনো সম্পর্ক নেই'। বোদলেয়ার, ফ্লবেয়ার, মালার্মে প্রমুখ বিখ্যাত মানুষ জন তাদের শিল্পকর্মে জাগতিক বাস্তবতা ও উপযোগিতার উর্ধ্বে গিয়ে কতগুলো মতবাদ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিকোণকে প্রশ্রয় দিলেন। তাদের নতুন ধরণের শিল্পকর্মে মানুষ জন নতুন স্বাদ পেলো। বাস্তবতা বিবর্জিত হলেও ওই সাহিত্য বা শিল্পকর্মে একটা বিশেষ ধরনের আবেশ ও সৌন্দর্য ছিল। কলাকৈবল্যবাদই পরে নতুন এক ধরনের আন্দোলনের জন্ম দেয় যেটার নাম ডেকাডেন্স বা

ক্ষয়িষ্ণুতা। বোদলেয়ারের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'লে ফ্যুর দ্য ম্যল' এর ১৮৬৮ সালের সংস্করণে গত্যিয়ে যে 'নোটিশ' জুড়ে দিয়েছিলেন তাতে ক্ষয়িষ্ণুবাদ আন্দোলনের মূলমন্ত্র তুলে ধরা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে এই আন্দোলন একদম শীর্ষে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ১৮৯০ দশকের অস্কার ওয়াইল্ড, আর্থার সিমন্স, আর্নেস্ত ডসন, লিওনেল জনসন, অর্বে বিয়ার্ডসলি এদের শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করলে ক্ষয়িষ্ণুবাদের তীব্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ক্ষয়িষ্ণুবাদের বিষয়বস্তু ছিলো সুপরিকল্পিতভাবে সকল আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড ওলট-পালট ও বিপর্যয় আনা। তাই জীবনের স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছলতাকে এড়িয়ে এই ধারার শিল্পীরা তাদের সৃষ্টিতে প্রবেশ করান কৃত্রিম সাজসজ্জা, মাদকদ্রব্য, বিকৃত সম্পর্ক ও অস্বাভাবিক যৌন আচরণের। ওয়াল্টার পেটার ফরাসি ক্ষয়িষ্ণুবাদ ইংল্যান্ডে নিয়ে এলেন এবং ১৮৭৩ সালে তাঁর 'দি রেনেসাঁস' গ্রন্থের মাধ্যমে পরামর্শ দিলেন চরিত্র বা ক্যারেক্টারের জীবনকে তীব্রভাবে তীক্ষ্ণতম অস্বাভাবিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ করতে। সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে সেই পরামর্শ ইংল্যান্ড থেকে ছড়িয়ে পড়ে তৎকালীন বিভিন্ন কলোনিগুলোতে। যার ফলে শিল্প - সাহিত্যে প্রবেশ ঘটতে থাকে অজানা অনুভূতির স্বাদাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায় মাদকদ্রব্য অথবা অবৈধ - অস্বাভাবিক প্রণয় সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা - নিরীক্ষার। এরই ধারাবাহিকতায় এই উপমহাদেশের বর্তমান সমাজে তুমুল জনপ্রিয় হচ্ছে স্যাকরেড গেমসের মতো অস্বাভাবিক যৌনাচার, অসুস্থ মানবিক সম্পর্ক আর মাদক গ্রহণে সুড়সুড়ি দেওয়া বিভিন্ন শিল্প কর্মের। শিল্পের ইতিহাসে কলাকৈবল্যবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে সফল না হলেও এসব মতবাদের কিছু কিছু অংশ (যেমন শিল্পের স্বয়ম্ভরতার ধারণা) বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ কর্মগুলোতে স্থান পায়। তবে আমাদের এখানকার সত্যিকার জীবন ধারা বিবর্জিত স্যাকরেড গেমসের মতো জনপ্রিয় কিন্তু নিন্দিত কর্মগুলো ইতিহাসের পাতায় কতটুকু সফল হবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। আপাতত বর্তমান বলছে এই ধরনের নতুন সংস্কৃতি চর্চার দরুন যে অভ্যাস মানসপটে চিত্রিত হবে সেটার জাতিগত ভবিষ্যৎ সুন্দর নয়।

লেখক : শফিক মুন্সি, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র আন্দোলন কর্মী, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিতে বিষখালী ও নদী রক্ষায় আমাদের করণীয়

শামীমা সুলতানা।

কথিত আছে, ধান-নদী-খাল এই তিনে বরিশাল। বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার মধ্যে ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে খরস্রোত নদী। যা বিষখালী নামে সুপরিচিত। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা বরগুনা। যেখানে আমার জন্মভূমি। শৈশব কৈশোরের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই নদীটি ঘিরে। নদীটির দৈর্ঘ্য ১০৫ কিলোমিটার গড় প্রস্থ ৭৬০ মিটার। এ নদীটি ৬০নং নদী হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'পাউবো' কর্তৃক স্বীকৃত।

বিষখালী নদীর উৎপত্তি ঝালকাঠি সদর উপজেলার ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন এলাকায় প্রবহমাণ সুগন্ধা নদী থেকে। এই নদীর স্রোতধারা রাজাপুর কাঠালিয়া ও বরগুনার বেতাগী উপজেলা অতিক্রম করে পাথরঘাটা উপজেলা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। গতিপথের প্রথম ৩০ কিলোমিটারের গড় প্রস্থ ১ কিলোমিটার। পরবর্তী ৬৬ কিলোমিটার এর গড় প্রস্থ ২ কিলোমিটার । গড় গভীরতা প্রায় ১৬ মিটার। বিষখালীর দুটি শাখা নদী রয়েছে। একটি বামনা উপজেলার বিপরীতে (পূর্ব দিকে) বদনিখালী খাল অপরটি সোজা দক্ষিণে ফুলঝুড়ি, কাকচিড়া অতিক্রম করে ঠিক পূর্ব দিকেই খাকদোন নদ। যেটি সরাসরি বরগুনা জেলা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। বর্তমানে এই খাল দু'টি পলি পড়ে ছোট হয়ে গেছে। পানি স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। বিষখালী নদীটি খরস্রোতা নদী। বিষখালী নদীটি সম্পূর্ণভাবে জোয়ার-ভাটা দ্বারা প্রভাবিত। বেতাগী, বামনা, বরগুনা এবং পাথরঘাটায় পানি সংগ্রহ করে লবণাক্ততা বিশ্লেষণ করা হয়।

অর্ধশত বছর পূর্ব থেকে এই নদীর স্রোতের গ্রাসে বিলিন হয়েছে আমুয়া, বামনার শত সহস্র বসত ভিটা ও ফসলি জমি। ভুমিহীন ও অসহায় হয়ে পড়েছে অনেক পরিবার। বিশখালী নদীর ভাঙনের ফলে আশঙ্কাজনক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তীরবর্তী বন্দর ও শহর। ভাঙন ও লবনাক্ততা রোধ করতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ভেড়ীবাধ দেয়া হয়েছে। নদীটিতে একদিকে যেমন রয়েছে ভাঙনের তান্ডব আবার অন্যদিকে রয়েছে বিভিন্ন স্থানে চর জেগে ওঠার দৃশ্য।

জীবন যাপনে প্রাকৃতিক সম্পদের মাঝে যা কিছু রয়েছে তার মধ্যে নদী অন্যতম। আজ এই বিশখালী নদীর কিছু অংশ যেনো মানব জীবনের মতো। যৌবনের লাবন্যতা হারিয়ে দুঃখজনক ভাবে বার্ধক্যে প্রবেশ করেছে। আমার শৈশবে ছিলো এই বিষখালীর ভরা যৌবন। বিষখালীর বুকে বয়ে চলতো অগনিত পাল তোলা নৌকা, মালবাহী জাহাজ। নদী বেষ্টিত দক্ষিণাঞ্চলের রাস্তাঘাটের তেমন উন্নতি ছিলোনা। মানুষের যাতায়াতের জন্য সুবিধামূলক ও সহজ পথ ছিলো নৌ পথ। আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, হাট-বাজারে যাওয়া শত ভাগই নির্ভর করত নৌকা, লঞ্চের উপর। বর যাত্রী যাওয়া বা বউ নিয়ে আসায় ব্যবহৃত হতো নৌপথ। বিভিন্ন ধরণের নৌকা থাকতো। ময়ূরপঙ্খী, পানসী, রকমারি ডিজাইনের রঙিন কাগজ কেটে সাজানো হতো বর বউয়ের নৌকা। মাইকে বিয়ের গান বাজতো উচ্চ শব্দে। আশেপাশের নদীতীরের মানুষ দাঁড়িয়ে বেশ উপভোগ করত। যেমনটি আমিও করেছি শৈশবে। নতুন দম্পতিরা বিষখালীর অপূর্ব সৌন্দর্য নিরবে উপভোগ করতো। নদীর বুকে চলতো সারি সারি কচুরিপানার ভেলা। সবুজ কচুরিপানার মাথায় কোমলমতি অপরূপ নীল সাদা ফুল বাতাসে দুলতো। নদীর পাড়ে সারি সারি ছইলা গাছ, কেওয়া বন,

হোগল পাতার ঘন সবুজের মোহনীয় দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যেতো। বিষখালী নদীর তীরবর্তী শত শত জেলে পরিবারের জীবন জীবিকা নির্ভর করতো এই নদীর উপরে। বড়ো ছোটো মাঝারি বিভিন্ন আকারের মাছ ধরা নৌকা ভাসতো জেলেদের। নানা প্রজাতির মাছে ভরপুর ছিলো এই নদী। ইলিশ মাছ ধরার নৌকা গুলো ছিলো আকারে খানিকটা বড়। সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা জেলেরা নির্দিষ্ট ঘাটে আসতো যা জেলে ঘাট নামে পরিচিত ছিলো। বেতাগী, বগুনার আঞ্চলিক ভাষায় বলা হতো জাইলা ঘাট। গ্রামের লোক সেখান থেকে মাছ কিনতো। তবে অনেকাংশ বিনিময়মূল্য হিসেবে চাল, ডাল, আলু ইত্যাদির প্রচলন ছিলো। যা বর্তমান সময়ে রূপকথার গল্প বলে মনে হবে। আজ তা অনেকটাই বিলুপ্ত প্রায়।

এই বিষখালী নদীকে ঘিরে রয়েছে আমার শৈশব ও কৈশোরের নানান স্মৃতি। বেতাগী উপজেলার গাবতলী গ্রামে আমার বেড়ে উঠা। নদীর পাশ দিয়েই গ্রামটি। প্রতিদিন স্কুলে যেতে নদীর সৌন্দর্য অবলোকন করতাম হৃদয়ের গহীনে। মেঠো পথে প্রকৃতির সাথে কথা বলতাম আনমনে। নদীতীরে ছোটো ছোটো শিশুদের কাদামাখা শরীরে খুঁজে পেতাম প্রকৃত গ্রাম বাংলার আদর্শ। প্রতিদিন নদীর ছোঁয়া পেতাম যাওয়া আসার পথে খেয়া পার হতে। হাতে মেখে নিতাম সুরভিত জলের স্পর্শ।

নিজ চোখে দেখেছি বিষখালীর উত্তাল ঢেউয়ের তাণ্ডব। আবার কখনো দেখেছি ষোড়শী ললনার লাজুক বদনে। এই নদীর সুবাদে পেয়েছি বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছের স্বাদ। যা আজকাল হারিয়ে গেছে প্রায়। নাব্যতা কমে গেছে মনুষ্য সৃষ্ট দখলদারিত্ব ও পানি দূষণের কারনে। গ্রাম থেকে শুরু করে শহর সবখানেই আমরা ময়লা-আবর্জনা সবকিছু নদীতে ফেলছি। শিল্প-কারখানার বর্জ্য নদীতে ফেলছি। উজান থেকে নেমে আসা পলি এসে পড়ছে নদীতে। ময়লা-আবর্জনার কারণে একদিকে যেমন জলজ প্রাণী হুমকিতে পড়ছে। অন্যদিকে নদীও ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

নদীতে পানির প্রবাহ ঠিক রাখা এবং দখল রোধের দায়িত্ব দেওয়া আছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পানি উন্নয়ন বোর্ডকে। নদীর দূষণ রোধের দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের। এভাবে নদী রক্ষার সঙ্গে জড়িত আছে ২৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। নদীর অবৈধ দখল ও পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে আছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনও। আছে তবুও রক্ষা পাচ্ছে না নদী।

নদী রক্ষায় সম্ভাব্য করনীয় কিছু বিষয়ঃ

১। আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করা।
২। প্রয়োজনে নদী রক্ষার সুবিধার্থে আইনের ধারা সংযোজন করা।
৩। আলাদাভাবে নদী আদালত গঠন করা।
৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ ও মৎস অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তরের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।
৫। নদী ধ্বংসের সকল দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি প্রদান করা।
৬। সকল রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসা।
৭। পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে খনন করা।

এরকম বহুবিদ পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিষখালী নদী সহ বাংলাদেশের সকল নদীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে সরকার সহ সকল মানুষের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

শামীমা সুলতানা, প্রকাশক ও সম্পাদক, পুষ্পকলির কথা

অধ্যয়নে বই, আলোকিত হই

ওহীর আলোকে ও বিশ্বনবী (স.) এর অমর আদর্শে আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব তথা চিরস্থায়ী শান্তির অন্বেষায়- বই পড়ুন ও বই কিনুন। (বিনামূল্যে বই পেতে লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন) বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ **(অবঃ অধ্যক্ষ) প্রফেসর মোসলেম উদ্দীন শিকদার** সংকলিত-

১। কুরআন ও হাদীসের দর্পণে মানব জীবন। (উভয় পুস্তক I.S.B.N কৃত)
২। রাসূল (স.) এর দাওয়াতী মিশন ও আজকের মুসলিম উম্মাহ্ (বিক্রয় মূল্য অনধিক ২০০/-)

প্রাপ্তিস্থান

বরিশাল শহরে
বুক ভিলা, ইসলামিয়া, এমদাদিয়া ও নিউ মাহবুব লাইব্রেরি (সদর রোড)
আল্ আমীন লাইব্রেরি- জামে কশাই মজজিদ গেট,
কলেজ লাইব্রেরি ও হক লাইব্রেরি, বিএম কলেজ মসজিদ গেট।

গৌরনদীতে
শরীয়াতীয়া লাইব্রেরি (আগৈলঝাড়া রোড) ও
ইসলামীয়া লাইব্রেরি (টরকী বন্দর)

বি.দ্র. এসব বইয়ের বিক্রয়মূল্য দুঃস্থ মানবতার কল্যাণে সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে ব্যয় করা হবে (ইনশাআল্লাহ)

প্রচারেঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম, আমার ফোন কম্পিউটার সেন্টার। ফোনঃ ০১৮১৩৬৪৬৭৬৭, ০১৭১২২৩৩২০০

বাঙালির ঐতিহ্য রূপালি ইলিশ বৃত্তান্ত

মো. জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ এবং ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের ইলিশ মাছ ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাগর ও নদী দুই জায়গায়ই ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র। ইলিশ পছন্দ করে না, এমন বাঙালি দেশে ও বিদেশে খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর। ইলিশ স্বাদে ও গুণে সত্যিই অতুলনীয়। সর্ষে ইলিশ দেখলে সকল বাঙালির জিহ্বায় পানি চলে আসে। সর্ষে ইলিশ, ইলিশ পোলাও, ইলিশ দোপেয়াজা, ইলিশ পাতুরি, ইলিশ ভাজা, ভাপা ইলিশ, স্মোকড ইলিশ, ইলিশের মালাইকারী - এমন নানা পদের খাবার বাংলাদেশের সকল বাঙালির কাছে খুবই জনপ্রিয়।

বিগত বছরগুলোতে ইলিশ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল এবং এমন প্রেক্ষাপটে মা ইলিশ শিকারের উপর অবরোধসহ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদন বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছে ভাতে বাঙালি যেন তার পুরানো ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে।

ইলিশ একটি চর্বিযুক্ত মাছ আর ইলিশে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড (ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড) রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় পাওয়া গেছে, এই অ্যাসিড মানুষের কোলেস্টোরেল ও ইনসুলিনের মাত্রা কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। এটি লবণাক্ত পানির মাছ। সাধারণত বড় নদী এবং মোহনায় সংযুক্ত খালে বর্ষাকালে পাওয়া যায়। এ সময় ইলিশ মাছ ডিম পাড়তে সমুদ্র থেকে বড় নদী এবং মোহনায় সংযুক্ত খালে আসে। ইলিশ মাছ সাধারণত চাষ করা যায় না। তবে ইদানিং চাঁদপুরের ইলিশ গবেষণা ইনস্টিটিউটে মিঠা পানির পুকুরে ইলিশের চাষ নিয়ে গবেষণা চলছে।

মৎস্য বিজ্ঞানীদের মতে, ইলিশ সারা বছর সাগরে থাকে। শুধু ডিম ছাড়ার জন্য নদীতে আসে। নদী ও সাগর দুই পদের ইলিশই টর্পেডো আকারের। কিন্তু নদীর ইলিশ একটু বেঁটেখাটো হয়, আর সাগরের ইলিশ হয় সরু ও লম্বা। সেই সঙ্গে নদীর ইলিশ বিশেষ করে পদ্মা ও মেঘনার ইলিশ একটু বেশি উজ্জ্বল। নদীর ইলিশ বেশি চকচকে হয় এবং রং একটু বেশি রূপালি হয়। সাগরের ইলিশ তুলনামূলক কম উজ্জ্বল। এছাড়া নদীর ইলিশ বিশেষ করে পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার ইলিশ মাছের আকার পটলের মতো হয় অর্থাৎ মাথা আর লেজ হয় সরু আর পেটটা হয় মোটা।

ভোজন রসিকেরা মনে করেন, নদীর ইলিশ আর সাগরের ইলিশের মধ্যে স্বাদে অনেক পার্থক্য আছে। ইলিশ মাছ আকারে যত বড় হয়, তার স্বাদ তত বেশি হয়। বড় আকারের ইলিশকে অনেকে পাকা ইলিশ বলে অভিহিত করে থাকে। সমুদ্র থেকে ইলিশ নদীতে ঢোকার পরে নদীর উজানে মানে স্রোতের বিপরীতে যখন চলে, সেসময় এদের শরীরে ফ্যাট বা চর্বি জমা হয়। এই ফ্যাট বা তেলের জন্যই ইলিশের স্বাদ অনন্য হয়। বর্ষাকালে পাওয়া ইলিশের স্বাদ সবচেয়ে বেশি হয়। বর্ষার মাঝামাঝি যখন, ইলশে গুড়ি বৃষ্টি হয়, সেই সময়ে নদীতে পাওয়া ইলিশের স্বাদ সবচেয়ে বেশি।

রন্ধন শিল্পীরা বলে থাকেন, ইলিশ মাছের প্রায় ৫০ রকম রন্ধন প্রণালী রয়েছে। সর্ষে ইলিশ, ভাপা ইলিশ, ইলিশ পাতুরি, কড়া ভাজা, দোপেয়াজা এবং ঝোল খুবই জনপ্রিয়। কচুর পাতা এবং ইলিশ মাছের কাটা, মাথা ইত্যাদির ঘন্ট একটি বিশেষ রান্না। ডিম ভর্তি ইলিশ মাছ এবং সুগন্ধি চাল দিয়ে বিশেষ একরকম রান্না করা হয় যা ভাতুরী বা ইলিশ মাছের পোলাও নামে পরিচিত। এটি বর্ষাকালের একটি বিশেষ রান্না। ইলিশ মাছ টুকরো করে লবণে জারিত করে অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। এভাবে সংরক্ষিত ইলিশকে নোনা ইলিশ বলে। এটা দিয়েও বিভিন্ন সুস্বাদু পদ রান্না করা হয়। বাংলাদেশে এই ইলিশ ভাপে, ভেজে, সিদ্ধ করে, কচি কলা পাতায় মুড়ে পুড়িয়ে, সরিষা দিয়ে, জিরা, বেগুন, আনারস দিয়ে এবং শুঁকিয়ে শুটকি করে, আরো বিভিন্ন প্রণালীতে রান্না করা যায়। ইলিশের ডিম অনেকের খুব জনপ্রিয় খাবার। এই মাছ রান্না করতে খুব অল্প তেল প্রয়োজন হয় কারণ ইলিশ মাছে প্রচুর তেল থাকে।

পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার বাজারে কম বেশি বাংলাদেশ থেকে পাঠানো ইলিশ পাওয়া যায়। এসব প্রবাসী বাঙালিদের কাছে ইলিশের কদর অন্যরকম। তাদের বিভিন্ন উৎসব, পালা পার্বণে ইলিশের উপস্থিতি অন্যরকম মাত্রা যোগ করে এবং বাঙালীরা বিদেশিদের ইলিশ দ্বারা আপ্যায়ন করতে পারলে তারা খুব গর্ব অনুভব করে থাকে। উত্তর আমেরিকার ইলিশ সব সময় পাওয়া যায়না বলে, বাঙালি অধিবাসীরা সাদ নামের একপ্রকার মাছ ইলিশের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে রান্না করে থাকে। সাদ মাছকে ইলিশের বিকল্প হিসেবে ধরা হয় কারণ এই মাছের রঙ ও স্বাদ প্রায় ইলিশের মতো।

ইলিশ মাছ প্রচুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম ইলিশ মাছে রয়েছে ২১.৮ গ্রাম প্রোটিন, ২৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১৮০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৩.৩৯ গ্রাম শর্করা, ২.২ গ্রাম খনিজ ও ১৯.৪ গ্রাম চর্বি। এ ছাড়া ইলিশ মাছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ, খনিজ লবণ, আয়োডিন ও লিপিড রয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর প্রতি ১০০ গ্রাম মাংসে খাদ্যশক্তির উপস্থিতির তুলনায় ইলিশ মাছে রয়েছে সবচেয়ে বেশি খাদ্যশক্তি। অন্যান্য মাংসের সঙ্গে ইলিশের তুলনা করলে দেখা যায়, প্রতি ১০০ গ্রাম হাঁসের মাংসে খাদ্যশক্তির পরিমাণ ১৩০ কিলোক্যালরি, মুরগির মাংসে ১০৯ কিলোক্যালরি ও খাসির মাংসে ১১৮ কিলোক্যালারি। তবে ইলিশ মাছে রয়েছে সর্বাধিক ২৭৩ কিলোক্যালরি পরিমাণ খাদ্যশক্তি। শরীর গঠন ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ইলিশ মাছ প্রোটিন ও অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড সরবরাহ করে। ইলিশ মাছে রয়েছে ভিটামিন এ এবং ডি। ভিটামিন এ রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে এবং ডি শিশুদের রিকেট রোগ থেকে রক্ষা করে। খনিজ, বিশেষ করে ফসফরাস দাঁত ও লৌহ স্বাভাবিক শরীর বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান।

তবে, ইলিশ মাছ খেলে কারও কারও শরীরে অ্যালার্জি বা গ্যাসের উদ্রেক হতে পারে। সেক্ষেত্রে আগে বুঝতে হবে তার শরীরে ইলিশ মাছের বিরূপ প্রভাব আছে কিনা, থাকলে এড়িয়ে চলাই ভাল। মনে রাখতে হবে, উচ্চ রক্তচাপ বা সুগারের রোগীদের জন্য ইলিশ মাছ ক্ষতিকর নয়।

এ বছর ইলিশের প্রাচুর্য্য দেখে মনে হয়েছে যেন, ইলিশের সেই সুদিন আবার ফিরে এসেছে। বিগত বছরগুলোতে যে পরিমাণ ও ওজনের একটি ইলিশ মাছের দাম যা ছিলো, তা এ বছর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্ধেকেরও কমে চলে এসেছে। তা ছাড়া দেড়-দুই কেজি ওজনের ইলিশও এ বছর বাজারে দেখা গেছে, আগে যা ছিলো স্বপ্নের মতো। সম্প্রতি, গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা নদীতে প্রায় তিন কেজি ওজনের একটি ইলিশ ধরা পরেছে এবং গত বছরও চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদীতেও ঠিক একই আকারের তিন কেজি ওজনের একটি ইলিশ ধরা পরেছিল। দাম যাই হোক, সব শ্রেণি-পেশার মানুষই তাঁদের স্বাদ, সংগতি ও সাধ্যের মধ্যে একেকটি ইলিশ মাছ কিনে খেতে পারছে।

অথচ বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষত, পহেলা বৈশাখ কিংবা অন্য কোনো পূজা-পার্বণের সময় নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে এ ইলিশ মাছ সোনার চেয়ে বেশি দামি বিবেচিত হয়। একটি বড় সাইজের ইলিশের দাম পাঁচ হাজার থেকে পনের বিশ হাজার পর্যন্ত উঠানামা করে। তখন ইলিশের কদর সবচেয়ে বেশি এবং বিত্তশালীরা ভোজন বিলাসিতার জন্য টাকার মূল্য বিবেচনা করে না। তখন ইলিশের আভিজাত্য স্বাদ ও গুণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। বিদেশি রাষ্ট্রীয় মেহমানদের কাছে ইলিশ শুধু স্বাদে ও গুণে অনন্য নয়, বরং তখন ইলিশ একটি ব্রান্ড এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। আমাদের সরকার প্রধান বিগত সময়ে ভারত সফরে গেলে উপহার হিসেবে ইলিশ নিয়ে যাওয়া হয় এবং সকল গণমাধ্যম বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে ফলাও করে প্রচার করে।

অনেক বাঙালি হিন্দু পরিবার বিভিন্ন পূজার শুভ দিনে জোড়া ইলিশ বা দুইটি ইলিশ মাছ কেনেন। সরস্বতী পূজা ও লক্ষ্মী পূজায় জোড়া ইলিশ কেনা খুব শুভ লক্ষণ হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু এই প্রথা পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) ও বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দুদের মাঝে প্রচলিত আছে। তাদের অনেকে লক্ষ্মী দেবীকে ইলিশ মাছ উৎসর্গ করেন। অনেকেই ইলিশ উৎসর্গ ছাড়া পূজাকে অসম্পূর্ণ মনে করেন।

গণমাধ্যমে খবর এসেছে, ইলিশের প্রাচুর্য্যের কারণে এ বছর অনেক জেলে ও ব্যবসায়ী ইলিশের এলাকা হিসেবে পরিচিত বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ইত্যাদি স্থানে বাড়িতে বাড়িতে ফেরি করে ইলিশ মাছ বিক্রি করেছে। আর কয়েক বছরের মধ্যে এবারে প্রচুর মাছ ধরতে পারায় জেলেদের মুখেও সারাক্ষণ হাসির ঝিলিক লেগে ছিলো। অনেক জেলে ভবিষ্যতে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে কারণ ইলিশ তাদের জীবন, জীবিকা ও আশা ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল।

ওয়ার্ল্ড ফিশের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের মোট ইলিশের প্রায় ৮৫% উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী ও সাগর থেকে প্রায় পাঁচ লাখ মেট্রিক টন ইলিশ আহরণ করা হয়। ইলিশ উৎপাদনের হিসেবে বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলার স্থান সবার শীর্ষে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই জেলায় মোট ইলিশ আহরণ হয় এক লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টনের মতো। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বরগুনা। গত অর্থ বছরে এই জেলা থেকে আহরিত ইলিশের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় এক লাখ মেট্রিক টন।

বরগুনার প্রধান তিনটি নদী বিষখালী, বুড়িশ্বর (পায়রা) ও বলেশ্বর নদী থেকে আহরণ করা হয় ৪৯০০ মেট্রিক টন এবং সাগর থেকে ৯১,০০০ মেট্রিক টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরগুনা জেলা থেকে আহরিত ইলিশের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৯৫ হাজার ৯৩৮ মেট্রিক টন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা। অন্যদিকে, একই অর্থবছরে চাঁদপুর থেকে ইলিশ ধরা হয়েছে প্রায় ৩৪ হাজার মেট্রিক টন। ইলিশ আহরণের হিসাবে এই জেলার অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে।

তবে এই চাঁদপুরকে 'ইলিশের বাড়ি' বলা হয় কারণ ইলিশ বিচরণ করে লোনা পানিতে, কিন্তু ডিম পাড়ার সময় তারা মিঠা পানির মোহনায় আসে। চাঁদপুরের পদ্মার কাছে তিন নদীর মোহনা প্রচুর পরিমাণে প্ল্যাঙ্কটন আছে, যেটা মা ইলিশের প্রধান খাবার।

যদিও ইলিশ লবণাক্ত পানির মাছ বা সামুদ্রিক মাছ, বেশিরভাগ সময় সে সাগরে থাকে কিন্তু বংশ বিস্তারের জন্য দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নদীতে পাড়ি জমায়। বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশে নদীর সাধারণ দূরত্ব ৫০ কিমি থেকে ১০০ কিমি। ইলিশ প্রধানত বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা এবং গোদাবরী নদীতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং প্রজননের জন্য এ এলাকাটিকে বেছে নেয়। ইলিশ মাছ সাগর থেকেও ধরা হয় কিন্তু সাগরের ইলিশ নদীর মাছের মত সুস্বাদু হয় না। চাঁদপুর জেলার তিন নদীর মিলনস্থলে ইলিশ মাছ বেশি পাওয়া যায় কারণ ইলিশ প্রজননের জন্য এটি একটি উত্তম জায়গা।

ইলিশ অর্থনৈতিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মাছ। বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপাঞ্চল, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর মোহনার হাওর থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ ধরা হয়। এটি সামুদ্রিক মাছ কিন্তু এই মাছ বড় নদীর মিঠা পানিতে ডিম দেয়। ডিম ফুটে গেলে ও বাচ্চা বড় হলে ইলিশ মাছ সাগরে ফিরে যায়। সাগরে ফিরে যাবার পথে জেলেদের শিকারে এই মাছ ধরা পড়ে। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম মূলত দুটি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (ভাদ্র মাস থেকে মধ্য কার্তিক) ও জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি (মধ্য পৌষ থেকে মধ্য ফালগুন)। তবে দ্বিতীয় মৌসুমের তুলনায় প্রথম মৌসুমে প্রজনন হার বেশি। মৎস্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে ইলিশের গতিপথ। বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেলে নদীতে পানি বৃদ্ধির সঙ্গে ইলিশের আমদানিও বাড়ে। তাছাড়া, তাদের মতে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে যদি এসব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তবে প্রতি বছরই ইলিশ মাছ এভাবেই সবার জন্য সহজলভ্য হবে। এজন্য মাঠ প্রশাসনের সুষ্ঠু তদারকির পাশাপাশি কঠোর নজরদারি করা যেমন দরকার, ঠিক একই সাথে ক্রেতা বিক্রেতা ও জেলেদের সচেতন হওয়া একান্ত জরুরি। এতে করে বাংলাদেশের জাতীয় মাছ হিসেবে পরিচিত ইলিশের হারানো গৌরব 'মাছে ভাতে বাঙালি' ফিরতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না।

মো. জিল্লুর রহমান
ব্যাংকার ও ফ্রিল্যান্স লেখক,
একটি শীর্ষ স্থানীয় শরীয়াহ ভিত্তিক প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরত।
zrbbbp@gmail.com,
মোবাইল-০১৭১৬৭৩৩৭১৪

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
সততাই ব্যবসার মূলধন
মেসার্স
মিশকাত এন্টারপ্রাইজ
স্বত্ত্বাধিকারী: মো: মিজানুর রহমান
ডিলার: এশিয়ান পেইন্ট
01711 456 714, 01920 527 670

রং, বার্নিশ, ওয়ার্কশপ হার্ডওয়ার সামগ্রী
খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা
৮৮৬ পূর্ব লাইন রোড, বরিশাল।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহের
যে সব ডিজাইন ও প্রিন্টিংয়ের কাজ
সাতরং সিস্টেমস এ তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে
- বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
- আব্রাহাম লিংকনের চিঠি
- কাব স্কাউট
- সিটিজেন চার্টার
- স্কুল ফিডিং
- মনিটরিং বোর্ড
- প্রান্তিক যোগ্যতা
- প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- স্মার্ট প্ল্যান
- সট্ অ্যানালাইসিস
- শিক্ষক যোগ্যতা
- শিক্ষা উপকরণ (প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)
- শিক্ষক পরিচিতি বোর্ড
- বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের তালিকা
- বরিশাল, বাংলাদেশ ও বিশ্ব মানচিত্র
- ৭টি মহাদেশ ও ৫টি মহাসাগরের মানচিত্র
- বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার মানচিত্র
- ক্লাস রুটিন
- বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা
- জন্ম ও মৃত্যু তারিখসহ বীরশ্রেষ্ঠদের ছবি
- জাতীয় ফুল, ফল, পশু, পাখি, মাছ, কবি, পতাকা ও গাছ
- জন্ম ও মৃত্যু তারিখসহ ভাষা শহীদদের ছবি।

এছাড়াও শিক্ষকদের পছন্দানুযায়ী উপকরণ তৈরি করে দেয়া হয়
সাতরং সিস্টেমস
বটতলা, উত্তর আলেকান্দা, বরিশাল
০১৭৮৮ ৭৭ ০০ ৬৩, ০১৭১১ ৯২৮৭১৯
saatrongsystems2014@gmail.com

জামায়াতে নামাজ আদায় মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মাদ আবদুল মাননান

একজন মুমিন যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করে থাকেন, কোনো ভাবেই যাদের নামাজ কাযা হয় না কিংবা অনিচ্ছা সত্বেও নামাজ ছুটে গেলে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে অনুশোচনা বা অপরাধবোধে হৃদয় ও মন ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে যায় তাদের জন্য আমার এ লেখা । আশা করি একজন নামাজিকে নিয়মিত জামায়াতে নামাজ আদায়ের বিষয়ে সচেতন করবে এবং তাকে মহল্লার একজন প্রথম শ্রেণির মুসুল্লী হিসাবে পরিগণিত করবে।

জামায়াতে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে মুসল্লিদের মধ্যে শ্রেণিভেদ আছে। প্রথম শ্রেণির মুসল্লিদের নামাজের ক্ষেত্রে উদাহরণ হলো জীবনের সকল কিছু নিয়ন্ত্রিত হবে মসজিদের জামায়াতের সময় কেন্দ্রিক। তার ঘুম, কর্মস্থলের কর্ম, হাটবাজার, লেনদেন, কৃষিকাজ, বিনোদন ও সফর সবকিছু। জামায়াতের সময় উপস্থিত, তার সব কিছু স্থগিত, জামায়াত শেষে তার কার্যক্রম ফের শুরু।

দ্বিতীয় প্রকার হল মধ্যম শ্রেণির মুসল্লি। জামায়াতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার কিন্তু কর্মে চলনে বলনে মননে শয়নে স্বপনে যে তৎপরতা থাকা দরকার তা প্রদর্শনে কখনও কখনও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ধরুন কেউ বাজার করতে গিয়েছে, বাজার শেষে হাতে বোঝা-বাট্টি , মসজিদে জামায়াতও শুরু হয়ে যাচ্ছে, বাসায় গিয়েই নামাজটা পড়ে নেই । অফিস বা সফর থেকে বাসায় পৌঁছেছে শরীরটা একটু ঘর্মাক্ত বা পরিশ্রমের অস্থিরতা, জামায়াতও তৈয়ার, কিন্তু অলসতা জড়িয়ে ফেলে, একটু বিশ্রাম নেই একাকী পড়ে নিব, গেল জামায়াত ছুটে। বাসায় নতুন মেহমান অথবা মেয়ে দেখতেই আসছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ইস্যু মেহমান রেখে নামাজে গেলেতো ভালও দেখায় না ঠিক আছে আজ বাসায়ই নামাজ পড়ে ফেলি ইত্যাদি।

তৃতীয়ত হলো দূর্বল মুসল্লিদের কথা, নামাজ ঠিকই পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে কিন্ত জামায়াতে নামাজ পড়তে হবে এ ব্যাপরে তেমন গুরুত্ব নেই। ঘটনাচক্র বা ভাগ্যক্রমে হয়ত কখনো মসজিদে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় কিন্তু শুধু একটা গেঞ্জি বা গামছা একটা মাথায় দিয়ে অথবা লুঙ্গি কিংবা তোয়ালে লেছে জায়নামাজ বানিয়ে শুরু করে দেয় নামাজ পড়া। নামাজ পড়া লাগে তাই পড়ছে, মহান রবের সমীপে নিজেকে একটু পরিপাটি বা একটু ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পড়ে মসজিদে গিয়ে যে উপস্থাপন করতে হয় সে জ্ঞান তাদের নেই।

আমার প্রশ্ন হলো বিশেষ কোনো পরিস্থিতি বা শরয়ী ওজর ব্যতীত জামায়াত বর্জন করে একাকী নামাজ পড়ার যে প্রবণতা আমাদের মাঝে আছে, এটা আমরা কোথায় পেলাম বা এর কেনো বিধান বা সূযোগ আদৌ আছে কি না?

সুলুল্লাহ (সা.) সারা জীবন জামায়াতের সাথেই নামাজ আদায় করেছেন। এমনকি ইন্তিকালপূর্ব অসুস্থতার সময়ও জামায়াত ছাড়েননি। সাহাবায়ে কেরামের পুরো জীবনকালও আমরা সেভাবে দেখতে পাই। আমরা জানি এক অন্ধ সাহাবিকে রসুলুল্লাহ (স.) বাসায় নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েও তাৎক্ষনিক আবার তা বাতিল করে দেন। শুধু তাই নয় রসুলুল্লাহ (স.) জামায়াত বর্জনকরীর বাড়িঘর লাকড়ি দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, শুধু নারী ও শিশুদের কারনে তা কার্যকরী করেননি।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিলো যে, একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত আর কেউ জামায়াতে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকেনি। (মুসলিম : ১০৪৬) যে ব্যক্তি মুনাফিকের মত মসজিদে না গিয়ে ঘরে একা নামায পড়ে, সে তার নবীর তরিকাকে ছেড়ে দিলো। আর যে নবির তরিকাকে ছেড়ে দিলো, সে পথভ্রষ্ট। (মুসলিম, নাসাঈ)

আবু দারদা (রা.) বলেন- 'আল্লাহর শপথ, উম্মাতে মুহাম্মাদির জন্য জামায়াতের সাথে নামায পড়া থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে বলে আমি জানি না।, (বুখারি)।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দান করবেন ওই দিন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হল ওই ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে সার্বক্ষনিক যুক্ত থাকবে । (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করেন- সালাত কায়েম কর যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (সুরা বাকারা আয়াত ৪৩) এই আয়াত দ্বারা অনেক মুফাসসির জামায়াতে নামাজ ফরয হওয়ার দলিল প্রদান করেছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহপাক বলেন- সেইসব লোকেরাই আল্লাহর মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করবে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না। কারণ এরাই সঠিক পথের অনুসারী।' (সূরা তাওবা : আয়াত ১৮) ।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- মুমিনরা সফল কাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে একান্ত বিনয়াবনত (আল মুমিনুন আ: ১ ও২) অত্র সূরারই ৯ নং আয়াতে বলেছেন- যারা নিজেদের নামাজ সমূহের ব্যাপারে (যথাযথ সংরক্ষণ করে) যত্নবান হয়। সুতরাং আমরা কুরআন হাদিসের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টতই বুঝতে পারি প্রথম শ্রেণির মুসল্লির তালিকায় যদি নাম লেখাতে হয়, তবে অবশ্য অবশ্যই আমাদের সকল কার্যক্রম চিন্তা চেতনা নিয়ন্ত্রিত হবে ফরয নামাজ মসজিদে জামায়াতে আদায়ের সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। দিনের শুরুতেই সারা দিনের কার্যসূচী বা পরিকল্পনায় পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে কোথায় পড়বেন, কোন মসজিদে কতটায় জামায়াত, সকল সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন হবে সে অনুযায়ী। মসজিদে জামায়াতে যোগদান করতে না

আমরা যারা প্রতিনিয়ত দ্বীনের দাওয়াত, সভা ও অনুষ্ঠানাদিতে যেয়ে থাকি, সমাজে যারা ভাল মুসল্লি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেওয়ার প্রত্যাশা ও করি তাদের সাথেও ওঠবস করে দেখেছি, তাকবিরে উলার সাথে জামায়াতে নামাজ পড়ার কী মর্তবা তা তারা ভুলে যান। একটু ইচ্ছা করলেই কিংবা মানুষিকতা একটু সজাগ বা প্রস্তুত রাখলেই সুন্দরভাবে জামায়াতে নামাজ পড়া সম্ভব, কিন্তু সমস্যা হলো পরিকল্পনাটাই থাকে ঢিলেঢালে বা দূর্বল। যেমন ধরেন নামাজের গুরুত্বের উপর একটি দারসুল কুরআন বা হাদিসের আলোচনা সভা চলছে, যোহরের জামায়াত শুরু ১.৩০ টায় আলোচনা যেন শেষই হয় না, শেষ করল কয়টায় ১.২৯ টায়। ওদিকে জামায়াত যে ছুটে যাচ্ছে সে খবর নেই। এরকম অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে যা আমার কাছে ঈমানের দৈন্যতা বা ইমানদারিত্বের অপরিপক্কতা বলে মনে হয়। আরেকটি বিষয় হল আমরা যে মহল্লা বা এলাকায় অবস্থান করি সে এলাকার একজন দ্বীনের দায়ি (খাদেম) হিসাবে পরিচয় দিতে হলে অবশ্য অবশ্যই সে এলাকার মসজিদের প্রথম শ্রেণির একজন মুসল্লি হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রথম কাতারে তাকবিরে উলার সাথে নামাজ আদায়ের বিষয়ে রসুল (স.) এর যে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে, তা পরিপূর্ণ আমল করতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাওয়াতের কাজে আপনি এত ব্যস্ত, সংশ্লিষ্ট মসজিদের আপনি যে একজন মুসল্লি সে পরিচয় যদি অন্যান্য মুসল্লিরা না জানে, কোনো রকম শেষ কাতারে গিয়ে মসজিদে একটু হাজিরা দিতে পারলেই যেন হল, সালাম ফিরালেই পিছন থেকে দৌড়, মসজিদে অবস্থানের যেনো সময়ই নেই, তাহলে মনে রাখতে হবে রসুল (স.) ও তাঁর সাহাবিদের জীবনের সাথে আপনার আমার জীবন সঠিকভাবে মিলছে না। হ্যাঁ মানুষের ব্যস্ততা থাকতেই পারে তাই বলে এটা যদি অভ্যাসে পরিনত হয়, তাহলে চরম ভাবে ব্যহত হবে আমাদের লক্ষ্যবস্তু, ছিটকে পরব আমরা আমাদের মূল মিশন থেকে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে তাকবিরে উলার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায়ের তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক: মুহাম্মাদ আবদুল মাননান, *বিশিষ্ট ব্যাংকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব*

ভারত প্রসঙ্গ, আবরার হত্যাকাণ্ড, অতঃপর...

মাহমুদ ইউসুফ

মুঘল সম্রাট আকবর বাংলাদেশ করায়ত্ত করেন ষোড়শ শতকে। বাংলার স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কররানির নিকট থেকে আকবরের সেনাপতি খানই জাহান ১২ জুলাই ১৫৭৬ তারিখে বাংলা কেড়ে নেয়। শুরু হয় বাংলার পরাধীনতা। একই সাথে শুরু সাম্রাজ্যবাদী দিল্লির লুটপাট। দিল্লির উপনিবেশে বাংলা হারায় তার ২৩৮ বছরের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব। বাংলার অর্থে সমৃদ্ধ হতে থাকে ভারত। রাজা মানসিংহ থেকে শুরু করে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ- সকল সুবাদারই বাংলার অর্থসম্পদ দিল্লিতে পাঠাবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সেই ধারাবাহিকতা আজও বর্তমান। এই আধুনিক যুগে এসেও বাংলাদেশের গ্যাস, নদী, সাগর, বন, বন্দর প্রভৃতি সম্পদ দখলে মরিয়া আধিপত্যবাদী ভারত। আমরাও আমাদের সব সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী ভারতের হাতে তুলে দিতে আগ্রহী। মুরগির খামারের কর্মচারী নিজেই মুরগিগুলো প্রতিদিন একটি দুটি করে ধূর্ত শিয়াল মামার মুখে তুলে দিচ্ছে। হায়রে দেশপ্রেম!

২) দেশভাগ ১৯৪৭। আসাম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম বঙ্গ নিয়েই বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো। কিন্তু এম কে গান্ধি, নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ, প্যাটেলদের ঔদ্ধত্যে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন, 'এই ফর্মুলা নিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু দিল্লিতে জিন্নাহ ও গান্ধীর সাথে দেখা করতে যান। শরৎ বসু নিজে লিখে গেছেন যে জিন্নাহ তাঁকে বলেছিলেন, মুসলিম লীগের কোনো আপত্তি নেই, যদি কংগ্রেস রাজি হয়। ব্রিটিশ সরকার বলে দিয়েছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত না হলে তারা নুতন কোনো ফর্মুলা মানতে পারবেন না। শরৎ বাবু কংগ্রেসের নেতাদের সাথে দেখা করতে যেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন, কারণ, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁকে বলেছিলেন, 'শরৎ বাবু পাগলামি ছাড়েন, কলকাতা আমাদের চাই।' মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরু কোন কিছুই না বলে শরৎ বাবুকে সরদার প্যাটেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কলকাতা ফিরে এসে শরৎ বসু খবরের কাগজে বিবৃতির মাধ্যমে একথা বলেছিলেন এবং জিন্নাহ যে রাজি হয়েছিলেন একথা স্বীকার করেছিলেন।' [অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ ৭৩-৭৪]

মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মালদহ, করিমগঞ্জে মুসলিম সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও জেলাগুলো কেড়ে নেয় ভারত। নেপথ্য ভূমিকায় ব্রিটিশ সরকার। ইতিহাসবিদ বিমলান্দ শাসনামল লিখেছেন, 'মুসলিম লীগ তাঁদের লিখিত দাবিতে কলকাতাকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। কারণ: ১. কলকাতা বন্দরের অধিকাংশ লস্কর মুসলমান ২. পূর্ব বাংলার পাট সবটাই কলকাতা বন্দর দিয়ে রপ্তানি করা হয়। অতএব কলকাতা বন্দর পূর্ব বাংলা না পেলে বন্দরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পূর্ব বাংলার পাটও রপ্তানি হতে পারবে না ৩. কলকাতার উন্নতিতে পূর্ব বাংলার অবদান বেশি।' [ভারত কী করে স্বাধীন হলো, পৃ ১৬৩] বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, কলকাতা গড়ে ওঠে পূর্ব বাংলার টাকায়। [অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ ৭৯] ব্রিটিশ আমলের দুশ বছর শাসন শোষনে কলকাতা সমৃদ্ধ হয় বাংলাদেশের অর্থে। বাংলাদেশ ছিলো কলকাতার পশ্চাদভূমি বা Hinterland। শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে কলকাতা-হুগলিতে। আর তার কাঁচামালের যোগান দেয় পূর্ব বাংলা। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘামে গড়ে ওঠা স্বাদের কলকাতা ছিনিয়ে নেয় কংগ্রেস ও মহাসভা। এ চক্রীর কনভেনার ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

৩) ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় ভারত কখনো বাংলাদেশের বন্ধু ছিলো না, এখনও নয়। ভারত চিরকাল আমাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে। বাংলাকে লুটপাটের মৃগয়াক্ষেত্র বানিয়েছে ওরা। সোনার বাংলাকে শ্মশান বাংলা বানিয়েছে তারা। আবরার ফাহাদ নিহত হয়েছে। দেশবিরোধী জাতীয় সন্ত্রাসের শিকার সে। এ পৈশাচিক খুনের বিচার কী হবে সেটা পরের কথা। মুল কথা হলো- আবরার কী মেসেজ দিয়ে গেছেন জাতির জন্যে? সত্য বললেই বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। দেশ ও দশের স্বার্থে কাজ করলেই মর্মান্তিক ট্রাজেডির শিকার। গ্যাস বাংলাদেশের ভোগ করবে ভারত, বন্দর বাংলাদেশের ভোগ করবে ভারত, নদী-সাগর বাংলাদেশের ভোগ করবে ভারত, মাছ বাংলাদেশের ধরবে ভারত, রাস্তা বাংলাদেশের গাড়ি চলবে ভারতের, সুন্দরবন বাংলাদেশের ধ্বংস করবে ভারত, সম্পদ বাংলাদেশের খাবে ভারত, টিভি-কাগজ বাংলাদেশের ব্যবহার করবে ভারত। এ হলো উন্নয়নের রোল মডেল! দেশপ্রেমিক গণমাধ্যম বন্ধ হয়ে যাবে। আর ভারতীয় মিডিয়ার অবাধ প্রবাহ। ইসলামি টিভি চলবে না, কিন্তু হিন্দি টিভি চাপিয়ে দিতে হবে জাতির ঘাড়ে। পণ্য বাজার, মিডিয়া বাজার, সংস্কৃতির বাজার, চাকরির বাজার সবই ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। আবরার হত্যাকাণ্ড জানান দিচ্ছে, বাংলাদেশকে হায়দারাবাদ, সিকিম, কাশ্মির, আরাকান বানাতে ভারত ও তাদের বাংলাদেশি দোসররা ঘুম হারাম করে দিয়েছে। আবরার শত্রুদের সম্পর্কে সজাগ করতে চেয়েছে জাতিকে। তাইতো তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে হায়েনারা। আবরারের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে জনতা কী জাগবে?

প্রোঃ মোঃ নুরুল হক সোহরাব
হক লাইব্রেরি-১
০১৭২৪-৮৫১৬৫৮, ০১৯১৫-২৯৬৬০৩
এখানে অনার্স, মাস্টার্স, ডিগ্রিসহ স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসার নতুন এবং পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
বি.এম কলেজ রোড (মসজিদ গেটের পশ্চিম পার্শ্বে) দ্বিতীয় স্টল, বরিশাল।

নদীর সাথে ঐতিহ্য হারাচ্ছে রকমারি নৌকা

নিয়ামুর রশিদ শিহাব

নদীমাতৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশের জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদী-খাল। প্রবহমানকাল থেকে এসব খাল-বিল আর নদীতে বিভিন্ন ধরনের নৌকা বয়ে চলছে। বর্ষাকাল এলে নৌকার ব্যবহার বেড়ে যায়। কিন্তু দিনে দিনে এসব নদী ও খাল গুলো হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ থেকে। সেই সাথে বিলুপ্ত হচ্ছে শত রকমের নৌকাও। গঠনশৈলী ও পরিবহনের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নৌকার প্রচলন রয়েছে। যেমন : ছিপ, বজরা, ময়ূরপঙ্খী, গয়না, পানসি, কোষা, ডিঙ্গি, পাতাম, বাচারি, রপ্তানি, ঘাসি, সাম্পান, ফেটি, নায়রী, সওদাগরী, ইলশা ইত্যাদি। এর মধ্যে অধিকাংশই প্রায় বিলুপ্তির পথে। কিছু আবার একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একই সাথে কমে যাচ্ছে মাঝি-মাল্লা ও নৌকা তৈরির কারিগরের সংখ্যাও।

প্রাচীন বাংলার অন্যতম কেন্দ্র চন্দ্রকেতু গড়ের কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এই চন্দ্রকেতু গড়ে পাওয়া বেশ কিছু পোড়ামাটির সিলে নৌকার উল্লেখ আছে। আবার দুটো নৌকার নামও পাওয়া গেছে সেখানে। একটা হলো 'এপ্য' বা এপ্পগ অন্যটা 'জলধিসক্র' (জলধিশক্র)। জলধিশক্রটা ছিলো সম্ভবত যুদ্ধ জাহাজ।

খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতকের পেরিপ্লাসের বিবরনীতেও এপ্পগ নামের জলযানের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসা মঙ্গল ও চন্ডী মঙ্গলেও বাংলা অঞ্চলে নদীপথ ও সমুদ্রপথে চলাচলে উপযোগী দাড়-টানা পন্যবাহী জলযান নৌকা বা ডিঙ্গার কথা আমরা একাধিক বার খুঁজে পাই। কবি মুকুন্দ রায় আর চন্ডিমঙ্গলে 'জঙ্গ' নামের এক ধরনের বাণিজ্যিক জাহাজের কথা লিখেছিলেন। এখনও বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জামালপুর এলাকায় 'ঝঙ্গ' নামের এক ধরনের নৌকা দেখা যায়, যা সম্ভবত সেই প্রাচীন 'জঙ্গের'ই উত্তরসুরি। পনেরো শতকের শেষের দিকের কবি বিপ্রদাস পিপলয়, মুকুন্দরায়ের বর্ণনায় বর্ণাঢ্য নাম আর বিবরণে সব নৌকা উঠে এসেছে মাঝে মাঝে। কী দারুণ সব নাম ছিলো; নরেশ্বর, সর্বজয়া, সুমঙ্গল, নবরত্ন, চিত্ররেখা, শশিমঙ্গল, মধুকর, দূর্গাবর, গুয়ারেখি, শঙ্খচূর আরও অনেক কিছু! সে সময়ে নৌকা বাননো হত কাঁঠাল, পিয়াল, তাল, শাল, গাম্ভরি, তমাল প্রভৃতি কাঠ দিয়ে।

মুসলমান শাসকদের আগমনের পরে বাংলার নৌ-শিল্পের আরও বিকাশ হয়েছিল। কারণ এরা দেখেছিলেন কীভাবে বাংলার স্থানীয় শাসকগণ এই নদী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন স্বাধীনভাবে শাসন করেছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের নৌকার গ্যালারিতে যে বিশাল সাইজের একটা নৌকা আছে তা কি আপনারা কখনো খেয়াল করেছেন? বাংলার ঐতিহ্যবাহী সব নৌকার রেপ্লিকা আছে সেখানে, সাথে প্রমাণ সাইজের একটা নৌকা যার আকার অনেক বড়।

নৌকার কথা বললে আমাদের চোখে সাধারণত ভেসে ওঠে পালতোলা বা ছইওয়ালা ছোটোখাটো গড়নের একটা ফিগার। কিন্তু বাংলাদেশে এক সময়ে যে হরেক রকমের নৌকা ছিলো। তবে গঠনশৈলী ও পরিবহনের উপর নির্ভর করে, এখনও বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নৌকার প্রচলন রয়েছে।

নৌকার চালককে বলা হয় মাঝি। নৌকায় বিভিন্ন অংশ থাকে। যেমন : খোল, পাটা, ছই বা ছাউনি, হাল, দাঁড়, পাল, পালের দড়ি, মাস্তুল, নোঙর, গলুই, বৈঠা, লগি ও গুন। নৌকা প্রধানত কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। ছই বা ছাউনি এবং লগি বনানো হয় বাঁশ দিয়ে আর পাল তৈরি হয় শক্ত কাপড় জোড়া দিয়ে। খোলকে জলনিরোধ করার জন্য এতে আলকাতরা লাগানো হয়।

কিছু নৌকার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সাম্পান : 'সুন্দর সাম্পানে চড়ে মাধবী এসেই বলে যাই'– রফিক আজাদের এই কবিতার লাইনের মতোই এ দেশের লোকগীতি ও সাহিত্যের পরতে পরতে এই সাম্পানের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের নৌকার মধ্যে সাম্পান সবচেয়ে পরিচিত। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায় সাম্পান। চট্টগ্রাম আর কুতুবদিয়া এলাকায় সাম্পান নৌকা বেশি দেখা যায়। এই নৌকাগুলোর সামনের দিকটা উঁচু আর বাঁকানো, পিছনটা থাকে সোজা। সাম্পান একটি ক্যান্টনিজ শব্দ, যা সাম (তিন) এবং পান (কাঠের টুকরো) থেকে উদ্ভব। আভিধানিক অর্থ 'তিন টুকরো কাঠ'। একজন মাঝি চালিত নৌকাটি মালামাল পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। বড় আকারের সাম্পানও দেখা গেছে, যাতে ৭জন মাঝি আর তিনকোণা আকারের তিনটি করে পাল থাকতো। বর্তমানে তা হারিয়ে গেছে।

বজরা নৌকা : আগের দিনে বাংলার জমিদার এবং বিত্তশালীদের নৌ-ভ্রমণের শখের বাহন ছিল বজরা। এতে খাবার-দাবার ঘুমানোসহ নানা সুবিধা থাকত। কোনোটাতে পালও লাগানো হতো। এতে ৪ জন করে মাঝি থাকত। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতির কারণে বহু আগেই এই নৌকার কদর কমেছে।

ময়ূরপঙ্খী : প্রাচীনকালে রাজা-বাদশাহদের শৌখিন নৌকার নাম হলো ময়ূরপঙ্খী। এর সামনের দিকটা দেখতে ময়ূরের মতো বলে এর নাম দেয়া হয়েছে ময়ূরপঙ্খী। নৌকাটি চারজন মাঝিকে চালাতে হতো। এই নৌকায় থাকত দুটো করে পাল। ১৯৫০ সালের পর থেকে একেবারেই বিলুপ্ত এটি।

ডিঙ্গি নৌকা : সবচেয়ে পরিচিত নৌকা হচ্ছে ডিঙ্গি। নদীর তীর বা হাওড়-বাওড়ে যারা বাস করে, তারা নদী পারাপার, মাছ ধরা ও অন্যান্য কাজে এই নৌকাটি ব্যবহার করে। আকারে ছোটো বলে এই নৌকাটি চালাতে একজন মাঝিই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে এতেও পাল লাগানো হয়। এখনো গ্রাম-গঞ্জে ডিঙ্গি'র দেখা মেলে।

ডোঙ্গা : তালগাছের কাণ্ড কুঁদে এ নৌকা বানানো হয়। একে তালের নাও-কোন্দা নামে পরিচিত। ডোঙ্গা বেশ টেকসই। কিন্তু

পার্শ্বদেশ বা বিস্তার এতই কম যে, এতে খুব বেশি মানুষ বা মালামাল বহন করা যায় না। একটু বেসামাল হলে, ডোঙ্গা উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তাল গাছের কাণ্ড সহজে পঁচে না বলে ডোঙা বেশ কয়েক বছর ব্যবহার করা যায়।

পালতোলা পানসি : নৌ-ভ্রমণে দূরে কোথাও যাওয়ার একমাত্র ও অন্যতম মাধ্যম ছিল পালতোলা পানসি। সম্রাট আকবরের আমলে এ নৌকায় করে জমিদাররা বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। বর্ষায় ভাটি অঞ্চলে নাইওরি বহনে এই নৌকার জনপ্রিয়তা ছিল। এই পানসীতে চড়ে মাঝি মাল্লার ভাটিয়ালি, মুর্শিদ আর মারফতি গান গেয়ে মন কেড়ে নিতো যাত্রীদের। বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলে এটি প্রচুর দেখা যেতো। গ্রামগঞ্জের নৌপথে চলাচলে ইঞ্জিনচালিত নৌকা এর স্থান দখল করে নেওয়ায় এর চাহিদা এখন আর নেই।

ছইওয়ালা বা একমালাই : পালতোলা পানসির মতো ছুঁইওয়ালা একমালাই ছিলো দূরপাল্লার নৌকা। আজও এর দেখা মেলে। বরিশালের দুগুমি গ্রাম ও এর আশপাশের এলাকাসহ উজিরপুর উপজেলার জল্লা ইউনিয়নের শতাধিক পরিবারের সদস্যরা ছুঁইওয়ালা নৌকার মাঝি হিসেবে বাপ-দাদার এ পেশাকে এখনো আঁকড়ে ধরে রেখেছেন।

কোসা : বর্ষাকালে চরাঞ্চলে বা বিলে ডোঙা দেখা যায়। অন্যান্য নৌকার মতো এর গলুইয়ের কাঠ বড় থাকে না। অঞ্চল বিশেষে এর আকার ছোট বড় দেখা যায়। কোষা মূলত পারিবারিক নৌকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাটবাজার, স্বল্প দূরত্বে চলাচলের কাজে লাগে। একটি আদর্শ কোষা নৌকাতে আটজনের মতো যাত্রী বহন করা যায়। সাধারণত কোষাগুলোতে ছই থাকে না। কোষা বৈঠা দিয়ে চালানো হয়। তবে অগভীর জলে লগি ব্যবহার করে চালানো যায়।

গয়না নৌকা : মাঝারি বা বড় আকারের গয়না নৌকা মূলত যাত্রী পারাপারের কাজেই ব্যবহার করা হতো। এর ওপর বাঁশ দিয়ে তৈরি মাচার ছাদ থাকে। একসঙ্গে প্রায় ২৫-৩০ জন যাত্রী বহন করার ক্ষমতা ছিল এই নৌকাটির।

ইলশা নৌকা : ইলিশ মাছ আহরণে জেলেরা এই নৌকা ব্যবহার করে থাকে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এসব নৌকাও পাল লাগানো থাকে।

বাতনাই নৌকা : দক্ষিনাঞ্চলে মালামাল পরিবহনের ব্যবহৃত নৌকা বাতনাই, যা পদি নামেও পরিচিত। এই নৌকাগুলো চালাতে ১৭-১৮ জন মাঝি লাগত। এতে ১৪০-১৬০ টন মাল বহন করা যেত। এই ধরনের নৌকায় থাকত বিশাল আকারের চারকোনা একটি পাল। যান্ত্রিক নৌকার ব্যবহারের কম খরচ ও কম সময় লাগে বলে এ নৌকার ব্যবহার কমে গেছে। এসব নৌকা এখন আর বাংলাদেশের কোথাও দেখা যায় না।

ঘাষী : ভারি এবং বেশি ওজন বহন করার উপযোগী নৌকা হল 'ঘাসী নৌকা'। এটি মালামাল পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হতো। তবে এখন আর ঘাষী নৌকা দেখা যায় না।

মলার : পাবনা অঞ্চলে একসময় তৈরি হতো মলার নৌকা। এটাও মূলত মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হতো। ১২ থেকে ৫৬ টন ওজনের ভার বহনে সক্ষম মলার নৌকায় পাল থাকে দু'টি, দাঁড় ছয়টি। এ ধরনের নৌকাও এখন বিলুপ্তির পথে।

বালার নৌকা : কুষ্টিয়া অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৌকা ছিল বালার। এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সেই প্রাচীনকাল থেকে এই নৌকা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই নৌকাগুলো আকারে বড় হয়, যা দৈর্ঘ্যে ১২-১৮ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। বৈঠা বায় ১০-১২ জন মাঝি। এ নৌকায় পাল থাকে দুটো।

সওদাগরি নৌকা : ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য সওদাগরগণ এই নৌকা ব্যবহার করে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। এসব নৌকায় বহু ওজন বহন করার ক্ষমতা ছিলো। এতেও পাল লাগানো হতো। যা এখন বিলুপ্ত।

বাচারি : বাচারি নামের নৌকাটিও বাণিজ্যিক নৌকা ছিলো। ৪০ টন ওজনের ভার বহনে সক্ষম বাছারি গত কয়েক দশক আগেই বিলুপ্তির পাতায় চলে গেছে।

পাতাম : পাতাম একধরনের যুগল নৌকা। দুটি নৌকাকে পাশাপাশি রেখে 'পাতাম' নামক লোহার কাঠাটা দিয়ে যুক্ত করে এ যুগল নৌকা তৈরি করা হয়। একে অনেক সময় 'জোড়া নাও' বলা হয়। এ নৌকা মূলত মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে মাঝি ছাড়া চারজন দাঁড় টানা লোক থাকে। এতে একটি পাল খাটানোর ব্যবস্থা থাকে। এক সময় এই নৌকা সিলেট ও কিশোরগঞ্জে অঞ্চলে দেখা যেতো। এখন বিলুপ্তপ্রায়।

বাইচের নৌকা : নৌকা বাংলাদেশে এতটাই জীবনঘনিষ্ঠ ছিলো যে, এই নৌকাকে ঘিরে অনেক মজার মজার খেলা হতো। নৌকাবাইচ এখনো একটি জনপ্রিয় খেলা। বর্ষাকালে সাধারণত এ খেলার আয়োজন করা হয়। বাইচের নৌকা লম্বায় ১৫০-২০০ ফুট পর্যন্ত হয়। প্রতিযোগিতার সময় আকার ভেদে ২৫-১০০ জন পর্যন্ত মাঝি থাকতে পারে। এসব বাইচের নৌকার আবার নাম দেয়া হতো। যেমনঃ পঙ্খিরাজ, দ্বীপরাজ, সোনার তরী প্রভৃতি। এখনোও মাঝে মাঝে দেখা মেলে।

শ্যালো নৌকা : বিশ শতকের শেষে নব্বইয়ের দশকের দিকে বাংলাদেশের নৌকায় মোটর লাগানো শুরু হয়। এর ফলে নৌকা যান্ত্রিক নৌ-যানে রূপান্তরিত হয়। পানি সেচে ব্যবহৃত শ্যালো পাম্পের মোটর দিয়ে স্থানীয় ভাবে এসব নৌকা চালানো হয় বলে একে শ্যালো বা ইঞ্জিন চালিত নৌকা নামে পরিচিত।

আধুনিক প্রযুক্তির যুগে যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নয়ন ও নদীর নাব্যতা সংকটের কারণে নৌ-পথ ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমে গেছে। এ জন্য নৌকার ব্যবহারও দিনে দিনে কমে গেছে। তবে এসব নৌকা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিল্প ছিলো, তা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। শীঘ্রই এগুলো সংরক্ষণ করা না হলে অচিরেই হারিয়ে যাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পটি।

লেখক: নিয়ামুর রশিদ শিহাব, শিক্ষার্থী, কম্পিউটার টেকনোলজি, বরিশাল পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট

আল কুরআনে নদী ও সাগর

তৈয়বুর রহমান আজাদ

মানুষ আল্লহর বান্দা, গোলাম ও দাস। এই দাসদের প্রতি অনুগ্রহ করে আল্লহ পাঠিয়েছেন সংবিধান আল কুরআন। রহমানের হুকুম মানার মধ্যেই দাসদের কল্যাণ। পৃথিবীতে আল্লহর আইন বাস্তবায়নের জন্যেই কুরআন অবতীর্ণ। দুনিয়ার দেশে দেশে প্রভুর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই দাসদের কাজ। সৃষ্টি যার আইন তার। মানুষের গড়া আইনে মানুষ চলতে পারে না। আইন তৈরি মানুষের কাজ নয়, তাদের কাজ হলো আইন বাস্তবায়ন করা। আইন বানানো স্রষ্টার কাজ। এই আইনের সমন্বিত রূপই আল কুরআন। আল কুরআন সকল মানুষের একমাত্র গ্রহণীয় সংবিধান। কুরআন মুলত সংবিধান হলেও এর ভেতরে বিজ্ঞানের প্রচুর নির্দেশনা রয়েছে। ভূপ্রকৃতি, পানি, সাগর, নদী নিয়ে কুরআনের বয়ান বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত।

দূর-নিকট থেকে সাগর-নদীর দৃশ্য দেখতে অনিন্দনীয় সুন্দর। নদী সাগরের উত্তাল ঢেউ বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ার দৃশ্যটি আরও বেশি মোহনীয়। সাগর নদীর জোয়ার-ভাটার অপরূপ দৃশ্য মুগ্ধ করে না কাকে? নদীর এ নান্দনিক দৃশ্যের কথা কুরআনের একাধিক স্থানে উচ্চারিত হয়েছে। নদীর সাথে জীবনের রিশতা অবিচ্ছেদ্য। পানিই জীবন ও প্রাণের উৎস। সংবিধান আল কুরআনে নদী, সাগর, বৃষ্টি, জীবন ও প্রাণের এ গভীর সম্পর্কের নানা অনুসঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তাইতো আল কুরআন সব মানুষের জন্য এক আলোকবর্তিকা এবং গধৎরহব Science এর সাংকেতিক বার্তা।

১. তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন; উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না; উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল; দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন; অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সুরা আর-রহমান: ১৯-২৫)

২.'নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, জাহাজসমূহের চলাচলে- যা মানুষের লাভজনক এবং সম্ভার নিয়ে সমুদ্রে চলাচল করে।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৪)

৩.তোমাদের জন্যে সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটক বা মুসাফিদের জন্যে।' (সুরা মায়িদা: ৯৬)

৪. মুত্তাকিদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত তাতে আছে নির্মল পানির নদী, আছে দুধের নদী; যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদী, আছে পরিশোধিত মধুর নদী এবং তথায় তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। (সুরা মুহাম্মাদ: ১৫)

৫. আর যখন সাগরকে বিস্ফোরিত করে দেওয়া হবে। (সুরা ইনফিতার: ৩)

৬. এবং যখন সাগরসমূহকে উত্তাল করে তোলা হবে। (সুরা তাকভির: ৬)

৭. কে পৃথিবীকে করেছে আবাসযোগ্য এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সাগরের মাঝখানে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। আল্লহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (সুরা আন নমল: ৬১)

৮. আর তিনিই তাঁর রহমতের পূর্বে সুখবররূপে বাতাস প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তা ভারি মেঘ ধারণ করে, তখন আমি তাকে চালাই মৃত মাটিতে, ফলে তার দ্বারা পানি অবতীর্ণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে বের করি প্রত্যেক প্রকারের ফল। এভাবেই আমি মৃতদেরকে বের করি, যাতে তোমরা নসিহত গ্রহণ কর। (সুরা আল আরাফ: ৫৭)

ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন মুক্তবুলি পড়ুন, গ্রাহক হউন, বিজ্ঞাপন দিন

পাঠক যারা, লেখক তারা

মুক্তবুলি পাওয়া যাচ্ছে বরিশালের সবকটি পত্রিকা স্টল ছাড়াও সদর রোডের বুক ভিলা ও মাহবুব লাইব্রেরি এবং বিএম কলেজের সামনে হক লাইব্রেরি ও কলেজ লাইব্রেরিতে

প্রকাশক ও সম্পাদক: আযাদ আলাউদ্দীন

৪৫ জিলা পরিষদ মার্কেট, বটতলা বাজার
বরিশাল, মোবাইল: ০১৭১২-১৮৯৩৩৮

বরিশালে শাহীন শিক্ষা পরিবারের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ

মুক্তবুলি রিপোর্ট ॥

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হল শাহীন শিক্ষা পরিবার বরিশাল শাখার কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৯। ১৬ অক্টোবর বরিশাল মহিলা ক্লাবের হলরুমে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাহীন শিক্ষা পরিবারের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মাসছুদুল আমীন শাহীন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ্, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শাহীন শিক্ষা পরিবার বরিশাল শাখার পরিচালক মনসুর রহমান ও মোঃ আরিফুল ইসলাম।

আয়োজনের মধ্যে ছিল শাহীন স্কুলের ২য় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, এসইএফ ফাউন্ডেশন বৃত্তি প্রাপ্তদের সংবর্ধনা ও শাহীন শিক্ষা পরিবার বরিশাল শাখা থেকে ক্যাডেট কলেজে চূড়ান্তভাবে চান্সপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা। অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ প্রদান করা হয় ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, প্রতিষ্ঠানের লোগো সম্বলিত প্লেট, কাপ সেট, আয়াতুল কুরসির প্লেট, কলমদানি ও সিনারি।

সভাপতির বক্তব্যে মুহাম্মদ মাছুদুল আমীন শাহীন বলেন, আজকে যে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো তা নিঃসন্দেহে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে রায়হান মুহাম্মদ সালেহ্ বলেন, মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষক সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমি গর্বিত এটা জানতে পেরে যে, আমাদের দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য শাহীন শিক্ষা পরিবার সারা বাংলাদেশে তাদের শাখা কার্যক্রম বিস্তৃত করে আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছে।

মুক্তবুলি সাহিত্য আড্ডায় উপস্থিত নব্বই দশকের খ্যাতিমান কবি নয়ন আহমেদ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

সাতরং সিস্টেমস

saatrong systems

সৃজনশীল গ্রাফিক ডিজাইন ও প্রিন্টিং হাউজ

সাতরং ডিজাইন ও প্রিন্ট হাউজের বৈশিষ্ট্য

- সুলভ মূল্যে নির্ভুল ও সুন্দর ছাপা
- ইমেইলে প্রুফ ও ডিজাইন দেখার সুযোগ
- সময় ও কোয়ালিটির সাথে নো-কমপ্রোমাইজ
- মনোরম পরিবেশে কাজ করার সুযোগ
- হোম ডেলিভারি ও রিসিভ
- ডিজাইনে ক্রিয়েটিভিটি

ডিজিটাল প্রিন্ট

- সাইনবোর্ড
- ব্যানার
- ফেস্টুন
- বিলবোর্ড
- পিভিসি
- ভিনাইল/স্টিকার
- প্যানাফ্লেক্স
- ক্লিয়ার মিডিয়া
- প্লাস্টিক কার্ড
- টি শার্ট প্রিন্ট
- স্ক্রিন প্রিন্ট
- ক্রেস্ট
- চাবির রিং প্রিন্ট
- ছবিসহ মগ প্রিন্ট
- প্লেটে ছবি প্রিন্ট

অফসেট প্রিন্ট

- ক্যালেন্ডার
- ডায়েরি
- নোটবুক
- ম্যাগাজিন
- রিপোর্টস
- নিউজলেটার
- বই
- বুক কভার
- ব্রুশিওর
- পোস্টার
- লিফলেট
- গ্রিটিং কার্ড
- ভিজিটিং কার্ড
- ক্যাশমেমো
- প্যাড
- ক্যাটালগ
- আইডি কার্ড
- ফটো এডিটিং

সাতরং সিস্টেমস এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ধরণের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়।

সাতরং সিস্টেমস

saatrong systems

ঠিকানা : বটতলা, উত্তর আলেকান্দা (আলেকান্দা সরকারি কলেজের সামনে), বরিশাল

ফোন : ০১৭৮৮ ৭৭ ০০ ৬৩, ০১৭১১ ৯২ ৮৭ ১৯ ইমেইল : saatrongsystems2014@gmail.com

ওয়েব সাইট : www.saatrongsystems.com

সাতরং সিস্টেমস

Institute Code: 42119

সাতরং আইটি ট্রেনিংয়ে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড

অনুমোদিত ৩ ও ৬ মাস মেয়াদী কোর্সসমূহ

বিষয়	কোর্স ফি
কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন	৩৫০০/-
গ্রাফিক ডিজাইন ও মাল্টিমিডিয়া	৫৫০০/-
অটোক্যাড ২ডি	৩০০০/-
অটোক্যাড ৩ডি	৫০০০/-
ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং	৫০০০/-

কোর্সে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন চলছে

প্রতি সপ্তাহে নতুন ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়

মোবাইল
01788 770063
01787 518161

এছাড়াও **সাতরং সিস্টেমস** পরিচালিত কোর্সসমূহ

বিষয়	কোর্স ফি	সময়
আউটসোর্সিং/ফ্রিল্যান্সিং		
SEO/SMM+Market Place	৪৫০০/-	২ মাস
অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং	১২০০০/-	৩ মাস
গ্রাফিক্স বেইস আউটসোর্সিং	৬৫০০/-	২ মাস
স্কিল ডেভেলপমেন্ট অন ফটোশপ	৩৫০০/-	১ মাস
প্রফেশনাল ওয়েবপেজ ডিজাইন	৫৫০০/-	৩ মাস
ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট	৫৫০০/-	৩ মাস
কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও নেটওয়ার্কিং	৫৫০০/-	৩ মাস
ভিডিও এডিটিং ও ইউটিউব মার্কেটিং	৮০০০/-	৩ মাস

আরো রয়েছে এইচএসসি/ আলিম-এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোর্স, মাসিক ফি ৮০০/-

সাতরং আইটি-র বৈশিষ্ট্য

- অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক
- শতভাগ প্রাক্টিক্যাল ক্লাশ
- কম্পিউটার ল্যাবে ফ্রি প্রাক্টিসের সুযোগ
- অত্যাধুনিক নেটওয়ার্ক সিস্টেম কম্পিউটার ল্যাব
- সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট সুবিধা
- সিসি ক্যামেরা দ্বারা ক্লাস নিয়ন্ত্রণ
- প্রত্যেকের জন্য আলাদা কম্পিউটার
- কোর্স শেষে ফ্রি ইন্টার্নশিপ সুযোগ
- প্রতিটি ক্লাসের ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়া হয়

আসন সংখ্যা সীমিত
আগ্রহীগণ ভর্তির জন্য শীঘ্রই যোগাযোগ করুন

সাতরং সিস্টেমস
saatrong systems

উত্তর আলেকান্দা, বরিশাল
(সরকারি টেকনিক্যাল কলেজের সামনে)

cell : **01788 77 00 63**
email : saatrongsystems2014@gmail.com
web : www.saatrongsystems.com
fb : **facebook/** সাতরং সিস্টেমস বরিশাল

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত ৬মাস মেয়াদী শর্টকোর্স

কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন

কোর্স ফি এককালীন ২৫০০/-

এই কোর্সে যা শেখানো হবে

- এমএস ওয়ার্ড
- এমএস এক্সেল
- এমএস পাওয়ার পয়েন্ট
- ইন্টারনেট ও
- ই-মেইল

কম্পিউটারের বিভিন্ন কোর্সে

ভর্তি চলছে

এইচএসসি'র ICT

- **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি :** বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
- কমিউনিকেশন সিস্টেমস্ ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং
- সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস
- ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচটিএমএল
- প্রোগ্রামিং ভাষা
- ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

কোর্স ফি প্রতি মাসে ৮০০/-

সিটি কম্পিউটার একাডেমি

নুরজাহান ম্যানসন, টেলিটক কাস্টমার কেয়ারের দোতলায়,
বটতলা মসজিদের উত্তর পাশে, বরিশাল।
মোবাইল: 01913-811763, ইমেইল: bslcityca@gmail.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আইটি সল্যুশন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার

বটতলা বাজারের বিপরীতে জেলা পরিষদ মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, বটতলা, বরিশাল।

Phone: 01718-759250, 01918-350305
E-mail: it.solutionbd@hotmail.com, Web: www.ithdc.com

অসীম সম্ভাবনার অবিরাম সমাধান

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ল্যাব

এককালীন পরিশোধে সকল কোর্সে ১০% ছাড়

কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন	৩০০০/-
গ্রাফিক ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া	৫০০০/-
অটো ক্যাড (২ডি)	৩০০০/-
অটো ক্যাড (৩ডি)	৩০০০/-
৩ডি স্টুডিও ম্যাক্স	২৫০০/-
ওয়েব ডিজাইন	৫,০০০/-
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট	৫,০০০/-
আউটসোর্সিং	৫,০০০/-
ভিডিও এডিটিং	৬,০০০/-

আমাদের বৈশিষ্ট্য

★ অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ
★ প্রত্যেকের জন্য আলাদা কম্পিউটার
★ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা
★ গ্রাফিক এবং সিভিল কোর্সে ইন্টার্ণশিপের সুযোগ

ভর্তি চলছে

★ প্রত্যেক ক্লাসের ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান
★ ক্লাসের পরেও অনুশীলনের সুযোগ
★ কর্মজীবীদের জন্য সান্ধ্যকালীন ব্যাচ
★ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

ইঞ্জি. মো. হাবিবুর রহমান-01784-464188
ইঞ্জি. মো. রায়হান সৈকত-01918-444661

অসীম সম্ভাবনার অবিরাম সমাধান

হোম ডিজাইন এন্ড কনসালটেন্ট

আমরা যা করে থাকি

- আর্কিটেকচারাল ডিজাইন
- স্ট্রাকচারাল ডিজাইন
- সয়েল টেস্ট
- ডিজিটাল সার্ভে
- সুপার ভিশন
- ব্যাংক এস্টিমেট

বটতলা বাজারের বিপরীতে জেলা পরিষদ মার্কেট (২য়তলা), বরিশাল।

০৪৩১-৬১৩৬৩ | home.designbd@hotmail.com | ithdc.com

THE FIRST **SKILL BASED HI-TECH** UNIVERSITY IN BANGLADESH

Govt. & UGC Approved

www.ugv.edu.bd

UNIVERSITY OF GLOBAL VILLAGE (UGV) BARISHAL.

SUMMER 2019

ADMISSION GOING ON

(Regular & Evening Program)

- **B.Sc in Computer Science & Engineering (CSE)**
- **B.Sc in Electrical & Electronic Engineering (EEE)**
- **B.Sc in Civil Engineering (CE)**
- **Bachelor of Business Administration (BBA)**
- **Masters of Business Administration (MBA)**
- **Executive Masters of Business Administration (EMBA)**
- **Bachelor of Arts (Hon's) in English**

- Project Based Learning (PBL).
- Education exchange program with foreign university.
- Quality education at affordable cost.
- Be a proud students of world class scholars.
- Full time faculty members with PhD degrees from world reputed universities.
- Your gate way to skill based learning.
- Up to 100% waiver for meritorious and physically challenged students.
- Extra waiver for female students and children of freedom fighters.
- Globally recognized degrees.
- Convenient weekend and evening class.
- Progressive curriculum and industry focused specialization.
- Employment assistance through job placement cell.
- Enriched E-library.
- Fully automated online based system.
- Modern laboratory facility.
- Co-curricular activities through seven students clubs

UGV SPECIALTY

874/322, C&B Road, Barisal.

Tel: 0431-61521, 63503, 61374, 62765, 01763877777, 01722226680, 01877774040, 01877774050, 01877774005,

facebook.com/ugvbarisal

E-mail: ugvbarisal@gmail.com

কালুশাহ সড়ক ক্যাম্পাসে

ভর্তি চলছে

Admission Open!

আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা নিয়ে বরিশালে

ফুল টাইম স্কুলিং সহ...

Cambridge School & College

ক্যামব্রিজ স্কুল এন্ড কলেজ

আবাসিক
অনাবাসিক

English Version
Pre-play to
Grade Two

বাংলা মিডিয়াম
প্রি-প্লে থেকে ৮ম শ্রেণি

- ফুল টাইম স্কুলিং
- English Environment
- Spoken & Computer শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- সি.সি ক্যামেরা দ্বারা ক্লাশ মনিটরিং
- আবাসিকে থেকে পড়া লেখার সু-ব্যবস্থা
- Lesson Plan অনুযায়ী পাঠদান

শুভ্র নীড়, হযরত কালুশাহ সড়ক, (ক্লাবের বিপরীতে), বরিশাল।
মোবাইলঃ ০১৭৯৪-৫১৫১০৬ -৭